Syllabus

(JSC, SSC, HSC, Bachelor degree level)

N.B. Students will bring only ball-point pens, nothing else.

....

[Questions and answers must be in Bengali language.]

Answer the following question and submit within .... hours. Answer of the question must not be more than 10 (ten) sentences.

Valmiki Ramayana (VR)

(বাল্মীকি রচিত রামায়ণ যদিও বিশাল, সেই সমস্ত কার্যকলাপই এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।)

Total teaching hours-30 (40-45 periods) Total questions-40 Total marks-200

প্রশ্ন-১। রামায়ণকে আদি কাব্য বলা হয় কেন?

উত্তরঃ রামায়ণ হচ্ছে বিশ্বের ইতিহাসে রচিত প্রথম কাব্য। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, এমন কি মহামুনি বেদব্যাস শাস্ত্রাদি রচনার পূর্বে আদি কবি বাল্মীকি মুনির অধীনে রামায়ণ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তারপর তাঁর আশির্বাদ নিয়ে মহাভারত ও পুরাণ আদি নানা শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাছাড়া আরও অনেক মুনি-ঋষি ও লেখকেরা রামায়ণ কাব্যের ভিত্তিতে বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। সেজন্য রামায়ণকে আদি কাব্য বা সমস্ত কাব্যের বীজ বলা হয়।

প্রশ্ন-২। রামায়ণে কয়টি কাণ্ড রয়েছে? সেগুলোর নাম কী কী?

উত্তরঃ রামায়ণে মোট সাতটি কাণ্ড। সেগুলো হচ্ছে-(১) আদি বা বাল কাণ্ড, (২) অযোধ্যা কাণ্ড, (৩) অরণ্য কাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, (৫) সুন্দর কাণ্ড, (৬) যুদ্ধ বা লঙ্কা কাণ্ড ও (৭) উত্তর কাণ্ড।

প্রশ্ন-৩। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী রামায়ণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নাই কেন?

উত্তরঃ শুকদেব গোস্বামী যেই কালে পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভাগবত কথা কীর্তন করেছিলেন সেই সময় পৃথিবীতে রামায়ণ কথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল এবং সর্বত্র তা নিয়মিতভাবে কীর্তিত ও অভিনীত হতো। সেজন্য ভাগবতের নবম স্কন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, "হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যেহেতু আপনি শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত বহুবার রাম কথা শ্রবণ করেছেন এবং এই বিষয়ে আপনি যথেষ্ঠরূপে অবগত, সেজন্য আমি সংক্ষেপে সেই বিষয়ে আপনার নিকট কীর্তন করছি"।

প্রশ্ন-৪। রামায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতে কী বলা হয়েছে?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবতমে (৯/১১/২৩) রামায়ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলা হয়েছে যে, পুরুষো রামরচিতং শ্রবণৈরূপধারয়ন। আনৃশংস্যপরো রাজন কর্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে।। অর্থাৎ "হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত শ্রবণ করেন, তিনি মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান"।

প্রশ্ন-৫। 'রামায়ণ' শব্দের অর্থ কী? রামায়ণকে "রমা আয়ন" বলা হয় কেন?

উত্তরঃ বিভিন্ন আচার্যগণ 'রামায়ণ' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছেন। একটি অর্থ হচ্ছে 'রামস্য আয়নম' অর্থাৎ ভগবান শ্রীরাম যে পথে গমন করেছেন তাঁর বর্ণনা। সূর্য যখন উত্তরে গমন করে তাঁকে বলা হয় উত্তরায়ন এবং সূর্য যখন দক্ষিণে গমন করেন তাঁর নাম দক্ষিণায়ন। তেমনই, ভগবান শ্রীরামের গতিপথের বিবরণকে বলা হয় রামায়ণ।

আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যিনি সমস্ত নর বা মানুষদের আশ্রয় তাঁকে বলা হয় নারায়ণ। তদ্রুপ, যে গ্রন্থ ভগবান শ্রীরামের আশ্রয় গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়, সেটিই হচ্ছে রামায়ণ। রামায়ণকে কোনো কোনো আচার্য 'রমা আয়ন' বলেছেন। রমা মানে রমাদেবী বা সীতাদেবী। তাই রামায়ণ হচ্ছে সীতাদেবীর মহৎ চরিত্রের বিবরণ, সীতা চরিত (রামায়ণ ১/৪/৭)। কোনো কোনো দেশে রামায়ণকে 'জানকীহরণ' বলা হয়।

প্রশ্ন-৬। রামায়ণ থেকে নববিধা ভক্তির দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তরঃ রামায়ণ হচ্ছে একটি ভক্তিগ্রন্থ এবং ভাগবতের মতো এখানেও নববিধা ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। নিচে নববিধা ভক্তির নয়টি অঙ্গের নাম এবং রামলীলা হতে সেই অঙ্গে যিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর নাম প্রদান করা হইলঃ (১) শ্রবণ-হনুমান, (২) কীর্তন-লব কুশ, (৩) স্মরণ-সীতাদেবী, (৪) বন্দনা-বিভীষণ, (৫) পাদসেবন-ভরত, (৬) দাস্য-লক্ষণ, (৭) পূজন/অর্চন-শবরী, (৮) সখ্য-গুহ ও সুগ্রীব এবং (৯) আত্মনিবেদন-জটায়ু।

প্রশ্ন-৭। রামায়ণের শিক্ষার সাথে ভগবদগীতার শিক্ষার সামঞ্জস্যতা প্রদর্শন করুন।

উত্তরঃ ভগবদ্গীতা যেমন সবকিছু ত্যাগ করে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে (গীতা ১৮/৬৬), তেমনি রামায়ণেও অনন্যভাবে ভগবান শ্রীরামের শরণাগত হওয়ার জন্য শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। রামায়ণে (৬/১৮/৩৩) ভগবান শ্রীরাম ঘোষণা করেছেন-সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ ব্রতং মম।। অর্থাৎ কেউ যদি একবার মাত্র 'আমি আপনার শরণাগত হলাম'-এইরূপ ব'লে আমার আশ্রয় চায়, সে যেই হোক না কেন, আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। সেটাই আমার ব্রত।

প্রশ্ন-৮। ভগবান রামচন্দ্রের প্রণাম মন্ত্র অনুবাদসহ লিখ।

উত্তরঃ

দক্ষিণে লক্ষণোহস্য বামে চ জনকাত্মজঃ।
পূরতো মারুতির্যস্য তম বন্দে রঘুনন্দনম।।

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

অনুবাদঃ যার ডানপাশে শ্রীলক্ষণ, বামপাশে জনকনন্দিনী ভগবতী সীতাদেবী, সামনে শ্রীহনুমান অবস্থান করছেন, সেই ভগবান রামচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি। হে সর্বশক্তিমান, সর্ব আনন্দপ্রদাতা শ্রীরাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, রঘুনাথ, সীতানাথ, জগন্নাথ রাম, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রশ্ন-৯। 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' কাকে বলে? এটি কে কার নিকট বলেছিলেন? কয়টি শ্লোকে?

উত্তরঃ বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি ১০০ টি শ্লোকে ভগবান রামচন্দ্রের সমস্ত লীলা সংক্ষেপে কীর্তন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে সেটির ভিত্তিতে মহর্ষি বাল্মীকি বিস্তৃতভাবে ২৪,০০০ শ্লোকে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। নারদ মুনি বর্ণিত সংক্ষেপে এই রামলীলাকে 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ' বলা হয় এবং কেউ যদি সেই সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাঠ করে তবে সমগ্র রামায়ণ পাঠের ফল সে লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন-১০। বিশ্বের ইতিহাসে শ্লোকের উদ্ভব কিভাবে হল? এই প্রসঙ্গে রামায়ণের শ্লোকটির উদ্ধৃত কর।

উত্তরঃ বাল্মীকি মুনি তার শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে তমসা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে প্রেম নিবেদনরত অবস্থায় এক ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চি পাখিকে দেখতে পান। কিন্তু হঠাৎ এক ব্যাধ তীর নিক্ষেপ করে পুরুষ পাখিটিকে হত্যা করে। তখন বাল্মীকি মুনি রেগে গিয়ে একটি সুর-তাল ও লয় সমৃদ্ধ বাক্য দিয়ে সেই নিষ্ঠুর ব্যাধকে অভিশাপ দেন। তিনি বলেন-

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাস্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।।

সেই ছন্দবদ্ধ বাক্য নিজ মুখ থেকে নির্গত হয়েছে দেখে মুনি নিজেই অবাক হয়ে যান। পরবর্তীতে, ব্রহ্মা সেখানে আবির্ভূত হয়ে বলেন যে, এটি তারই ইচ্ছায় সরস্বতী দেবীর দ্বারা মুনির মুখ থেকে নির্গত হয়েছে এবং এই ছন্দবদ্ধ বাক্য "শ্লোক" নামে প্রসিদ্ধ হবে। এইভাবে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম শ্লোকের আবির্ভাব হয়।

প্রশ্ন-১১। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতার নাম কি? ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কিভাবে হয়েছিল?

উত্তরঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতার নাম হচ্ছে বিভাণ্ডক ঋষি। বিভাণ্ডকের তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পদ হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ব্রহ্মালোকের এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই অপ্সরার নাম ছিল হর্ষা। হর্ষা বিভাণ্ডকের আশ্রমের আশে পাশে অবস্থান করে মধুর স্বরে বৈদিক মন্ত্র গান করছিল। বিভাণ্ডক মুনি সেই গান শুনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং সেই গান কে গাইছে তা দেখার জন্য যান। তখন তিনি হর্ষাকে দেখতে পান এবং হর্ষা বিভাণ্ডকের চরণে পতিত হয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেন। বিভাণ্ডক হর্ষাকে বর দিতে চাইলে হর্ষা তাঁর গর্ভে একটি সন্তান দান করতে বিভাণ্ডককে অনুরোধ করেন। তখন বিভাণ্ডক তাঁর কথা রক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর হাত থেকে বীর্যপাত করে তা হর্ষাকে দান করেন। বিভাণ্ডকের পতন হয়েছে দেখে হর্ষা তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ায় সেই বীর্যকে একটি হরিণের গর্ভে স্থানান্তর করে ব্রহ্মালোকে চলে যান। পরবর্তী দিন সেই হরিণ থেকে ঋষিশৃঙ্গ মুনির জন্ম হয়েছিল।

প্রশ্ন-১২। রোমপাদ রাজার রাজ্যে বৃষ্টি হচ্ছিল না কেন? পরবর্তীতে কিভাবে বৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তরঃ একদা রোমপাদ রাজা ব্রাহ্মণদের দান করছিলেন। সেই সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করতে গিয়ে তার হাতে একটি অতি মূল্যবান মণি উঠে এবং সেই মণি দান করবেন কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দিহান হন। তখন তিনি সেটির পরিবর্তে অন্য আরেকটি অল্প মূল্যবান মণি তাঁকে দান করেন। ফলে সেই ব্রাহ্মণ রাজ্যের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সাথে সেই রাজ্য ত্যাগ করে চলে যান। এর ফলে তাঁর রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল না কারণ ব্রাহ্মণেরা যদি যজ্ঞ না করে তাহলে বৃষ্টি হয় না। পরবর্তীতে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যখন সেই রাজ্যে পদার্পণ করেন, তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সেখানে ফিরে এসেছিল এবং মুনির শুদ্ধতা প্রভাবে সেখানে পুনরায় বৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৩। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং ভ্রাতা ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন ও পূর্বপুরুষের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর। দশরথের চার পুত্র কাদের অবতার?

উত্তরঃ মহারাজ খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র মহাযশস্বী রঘু। রঘু থেকে অজ এবং অজ থেকে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়। দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের নাম রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। এইভাবে ভগবান চার মূর্তিতে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দশরথের চার পুত্র ছিলেন বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ— এই চতুর্ব্যূহের অবতার। আরেকটি মতে তারা ছিলেন ভগবান বিষ্ণু, শঙ্খ, চক্র ও অনন্তনাগের অবতার।

প্রশ্ন-১৪। মহর্ষি বাল্মীকি ভগবান শ্রীরামের বাল্যলীলা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন কেন?

উত্তরঃ মহর্ষি বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনা করেছেন 'করুণ' রসে। সেজন্য পুরো রামায়ণ নানাবিধ ট্রাজেডিপূর্ণ। কিন্তু ভগবানের বাল্যলীলা অত্যন্ত মধুর ও আকর্ষণীয় এবং তা করুণ রসের বিপরীত। সেজন্য রসভঙ্গের ভয়ে মহর্ষি বাল্মীকি মুনি ভগবান শ্রীরামের বাল্যলীলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, মাত্র দশটি শ্লোকে তিনি রামের বাল্যলীলা সমাপ্ত করে দিয়েছেন। আর করুণ রসাত্মক ঘটনাগুলো তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন-১৫। রামচন্দ্র যদি একজন নারীকে অর্থাৎ তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন, তাহলে কিভাবে তিনি আদর্শ ব্যক্তি হলেন?

উত্তরঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনি তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করার জন্য শ্রীরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরাম তাকে বধ করতে চাচ্ছিলেন না কারণ সে ছিল একজন স্ত্রীলোক। তখন বিশ্বামিত্র মুনি রামকে বললেন যে, যদিও শাস্ত্রমতে একজন অবলা নারীকে কখনোই বধ করা উচিত নয়, কিন্তু সেই নারী যদি সমাজের অনিষ্টকারিনী হয় এবং সাধারণ মানুষদের নির্বিচারে অত্যাচার ও নির্যাতন করে, তখন বৃহত্তর হিতের স্বার্থে তাকে শাস্তি দেওয়া রাজার বা রাষ্ট্রের প্রতিনিধির কর্তব্য। এমনকি ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং ভৃগু মুনির স্ত্রী খ্যাতিকে হত্যা করেছিলেন কারণ তিনি অন্যায়ভাবে অসুরদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখন শাস্ত্রের নির্দেশ, গুরুদেবের নির্দেশ ও দেশের শান্তি শৃংখলা রক্ষার তাগিদে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন। সেজন্য, এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্বের কোনো হানি হয়নি।

প্রশ্ন-১৬। রামচন্দ্র কার নিকট হতে 'বলা' ও 'অতিবলা' বিদ্যা লাভ করেন? সেই বিদ্যা লাভের ফলে কী হয়েছিল?

উত্তরঃ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির নিকট হতে 'বলা' ও 'অতিবলা' বিদ্যা লাভ করেছিলেন। সেই বিদ্যা লাভের ফলে তাঁদের ভ্রমণের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে নতুন উদ্যমের সঞ্চার হয়েছিল, এবং তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রশ্ন-১৭। কুশনাভের কতজন কন্যা ছিল? পবনদেব তাদেরকে বৃদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিলেন কেন?

উত্তরঃ রাজা কুশনাভের একশ জন কন্যা ছিল। সেই কন্যাগণ একদা নদীর তীরে খেলছিলেন, তখন পবনদেব তাঁদের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান এবং তাঁদের বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। তখন সেই কন্যারা পবনদেবের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে, পবনদেব রেগে গিয়ে তাঁদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে সমস্ত বায়ুগুলো অপহরণ করেন, যার ফলে তাঁরা বৃদ্ধ মহিলায় পরিণত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৮। কোন্ ব্যক্তি গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসতে সফল হয়েছিলেন? শিব গঙ্গাকে তাঁর মস্তকে আটকে রেখেছিলেন কেন?

উত্তরঃ সগর রাজার বংশধর ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে নিয়ে আসার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাদেবী মর্ত্যে অবতরণ করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর তীব্র বেগ ধারণ করার জন্য শিব যেন রাজী হন, তাই শিবের তপস্যা করার জন্য ভগীরথকে নির্দেশ দিয়েছিলেন । ভগীরথের তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে ধারণ করতে সহমত হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গা যখন অবতরণের সময় অহংকারী হয়ে শিবসহ পাতালে প্রবেশে উদ্যোগী হলে, প্রভু শিব গঙ্গার অহংকার ভঙ্গ করার জন্য তাকে তাঁর জটার মধ্যে আটকে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন-১৯। গঙ্গা কিভাবে 'জাহ্নবী' নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

উত্তরঃ গঙ্গাদেবী যখন শিবের মস্তক থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিলেন, তখন তিনি জহ্নু মুনির আশ্রমের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই আশ্রমের সমস্ত কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যান। এর ফলে জহ্নু মুনি রেগে গিয়ে সমগ্র গঙ্গার জল পান করে গঙ্গাকে তাঁর উদরে আটকে রাখেন। তখন গঙ্গার মুক্তির জন্য ভগীরথ সেই মুনির নিকট প্রার্থনা করলে, জহ্নু মুনি তাঁর কানের মধ্য দিয়ে গঙ্গাকে মুক্ত ক'রে দেন এবং গঙ্গাকে তাঁর কন্যা বলে স্বীকার ক'রে নেন। এ কারণে জহ্নু মুনির কন্যা হিসেবে গঙ্গাদেবীর নাম হয় জাহ্নবী।

প্রশ্ন-২০। অহল্যার পতির নাম কী? তিনি পাথরে পরিণত হয়েছিলেন কেন?

উত্তরঃ অহল্যার পতির নাম হচ্ছে গৌতম মুনি। একদিন স্নান করার জন্য গৌতম মুনি নদীতে গিয়েছিলেন। তখন ইন্দ্রদেব অহল্যার রূপে আকৃষ্ট হয়ে গৌতম মুনির ছদ্মবেশে সেই মুনির আশ্রমে এসে অহল্যার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও অহল্যা বুঝতে পেরেছিলেন, এই ছদ্মবেশী ব্যক্তি আসলে দেবরাজ ইন্দ্র, তবুও তিনি ইচ্ছাপূর্বক তার সাথে রমণে ইচ্ছুক হয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তারপর ইন্দ্র যখন রমণ শেষে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গৌতম মুনি চলে আসেন, এবং সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে ইন্দ্র ও অহল্যা উভয়কে অভিশাপ দেন। তিনি অহল্যাকে পাথরে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন যার ফলে অহল্যা তার সুন্দর রূপ হারিয়ে পাথরে পরিণত হন।

প্রশ্ন-২১। শতানন্দ ঋষির পিতা-মাতার নাম কী? তিনি বিশ্বামিত্র মুনির প্রশংসা করেছিলেন কেন?

উত্তরঃ শতানন্দ ঋষির পিতা হচ্ছেন গৌতম ঋষি এবং মাতা হচ্ছেন অহল্যা। বিশ্বামিত্র মুনি যখন রাম ও লক্ষণকে নিয়ে মিথিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, যাত্রাপথে তিনি রামকে গৌতম ঋষির আশ্রমে নিয়ে যান এবং শতানন্দ ঋষির মাতা অহল্যাকে উদ্ধার করেন। সেই কারণে শতানন্দ ঋষি বিশ্বামিত্র মুনির প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

প্রশ্ন-২২। বিশ্বামিত্র মুনির সাথে বশিষ্ঠের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল কেন?

উত্তরঃ বিশ্বামিত্র ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় রাজা। একবার মৃগয়া করার সময় তিনি বশিষ্ঠ মুনিকে সম্মান প্রদানের জন্য তার আশ্রমে যান। কিন্তু বশিষ্ঠ রাজার সকল সৈন্যদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র তাতে সম্মত হন। কিন্তু সেই দরিদ্র আশ্রমে বশিষ্ঠ যে রাজভোগ ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করেন তা দেখে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে যান। পরে, তিনি জানতে পারেন যে, বশিষ্ঠের শবলা নামক কামধেনুর কারণে এই সব হয়েছে। তখন বিশ্বামিত্র জোরপূর্বক সেই গাভীকে হরণ করতে চান এবং সেই গাভী থেকে বহু প্রজাতির যোদ্ধারা আবির্ভূত হয়ে বিশ্বামিত্রের শত পুত্রকে হত্যা করে। তখন বিশ্বামিত্র প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং এইভাবে বিশ্বামিত্রের সাথে বশিষ্ঠের শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-২৩। ত্রিশঙ্কু কে ছিলেন? ত্রিশঙ্কু স্বর্গ কী?

উত্তরঃ ত্রিশঙ্কু ছিলেন ইক্ষাকু বংশের একজন রাজা। তিনি তার রূপের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং জীবিত দেহ নিয়েই স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন। সেই বাসনা পূরণের জন্য তিনি প্রথমে তার কুলগুরু বশিষ্ঠের ও তার পুত্রদের কাছে যান কিন্তু প্রথমে বশিষ্ঠ ও পরে বশিষ্ঠ পুত্রগণও তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, জীবিত অবস্থায় স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা তাকে পিশাচ দেহ লাভের অভিশাপ দেন। সেই পিশাচ দেহ পেয়ে ত্রিশঙ্কু তার বাসনা পূরণের জন্য বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র তাতে রাজী হলেও বহু প্রয়াসের পর তাতে ব্যর্থ হয়ে নিজের তপোবলের দ্বারা একটা অবিকল স্বর্গের প্রতিরূপ তৈরি করেন যা ত্রিশঙ্কু স্বর্গ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৪। শুনঃশেপ কে ছিলেন? পিতা মাতা তাঁর নাম শুনঃশেপ রেখেছিলেন কেন?

উত্তরঃ শুনঃশেপ ছিলেন ঋচীক মুনি ও কৌশিকির মেঝো পুত্র। দেবলোকে একটি কুকুর রয়েছে যেটির নাম হচ্ছে দেবশুনো। কেউ যখন শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় তাড়াহুড়ো ক'রে শাস্ত্রের মর্মার্থ না বুঝে পড়ে যেত, তখন তাকে বাধা দেওয়ার জন্য ঐ দেবশুনো কুকুরটি ডেকে উঠত। সেই কুকুরটি চাইত যেন সকলেই শাস্ত্র কেবল পড়ার জন্য না পড়ে বরং এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে। সেজন্য ঋচীক মুনি ও কৌশিকি দেবী তাঁদের মেঝো পুত্রের নাম সেই কুকুরের নাম অনুসারে "শুনঃশেপ" রেখেছিলেন, যাতে সে বড় হয়ে নানা শাস্ত্রের গভীর ও গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গমকারী একজন মহান ঋষি হতে পারে।

প্রশ্ন-২৫। জনক মহারাজের রাজ্যকে বিদেহপুর বলা হয় কেন?

উত্তরঃ একবার নিমি মহারাজের সাথে তাঁর গুরু বশিষ্ঠ মুনির যজ্ঞ বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল। সেই বিবাদ এতই তীব্র হয়েছিল যে, তারা পরস্পরকে মৃতুবরণ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর পর মুনি-ঋষিরা উভয়কেই জীবিত করে দিতে চেয়েছিলেন। বশিষ্ঠ মুনি পুনরায় জীবিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু নিমি মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় দেহটিই হচ্ছে যত দুঃখ কষ্টের কারণ। তাই তিনি আর দেহ ধারণ না করে ভগবৎধামে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। জড় দেহের প্রতি তাঁর সামান্যতম আসক্তিও না থাকায়, তাঁর নাম হয়েছিল বিদেহ এবং তাঁর রাজ্যের নাম হয়েছিল বিদেহপুর। জনক মহারাজ হচ্ছেন বংশ পরম্পরায় নিমি মহারাজের প্রতিনিধি এবং সেজন্য তাকেও বিদেহ বলা হতো। তিনি একজন মহান ভক্ত ছিলেন। বিদেহপুর বা মিথিলায় কোনো ব্যক্তিই তাঁর জড় দেহের প্রতি আসক্ত ছিলেন না।

প্রশ্ন-২৬। দশরথের চার পুত্রের সাথে যাদের বিয়ে হয়েছিল তাঁদের নাম লিখুন।

উত্তরঃ মহারাজ দশরথের চার পুত্র হচ্ছেন- রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। শ্রীরামের সাথে জনক মহারাজের দিব্যজাত কন্যা সীতার, লক্ষণের সাথে জনকের দ্বিতীয়া কন্যা উর্মিলার, ভরতের সাথে জনকের ভ্রাতা মহারাজ কুশধ্বজের প্রথমা কন্যা মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নের সাথে কুশধ্বজের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রুতকীর্তির বিবাহ হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৭। পরশুরাম একুশ বার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন কেন?

উত্তরঃ রাজা কার্তবীর্যার্জুন মহর্ষি জমদগ্নির কামধেনু হরণ করেছিলেন। তা জানতে পেরে জমদগ্নির পুত্র ভগবান পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য আক্রমণ ক'রে তাকে হত্যা করেন এবং সেই গাভীটিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। তখন কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জমদগ্নি ঋষিকে হত্যা করেন। পরশুরাম তা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে যান এবং শুধু কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদেরই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সকল ক্ষত্রিয়দের সংহার করার ব্রত গ্রহণ করেন। কারণ তখনকার ক্ষত্রিয়রা অন্যায় ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে ভগবান পরশুরাম একুশ বার সারা পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করার জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-২৮। একপত্নী ব্রত কাকে বলে? কে এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং কেন?

উত্তরঃ একপত্নী ব্রত মানে সারা জীবন কেবল এক পত্নীর সাথে কাটানোর ব্রত, দ্বিতীয় কোনো পত্নী কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ না করার সংকল্প। ভগবান রামচন্দ্র এই একপত্নী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এর একটি কারণ হচ্ছে সেই সময় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল যার কারণে পুরুষেরা অনেক বার বিয়ে করত। ভগবান রামচন্দ্র সেই প্রথার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি একপত্নী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আরেকটি কারণ হচ্ছে, ভগবান রামচন্দ্র হচ্ছেন আদর্শ পতি। তাই তিনি সীতাদেবীকে ছাড়া আর কাউকে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করতে চান নাই।

প্রশ্ন-২৯। মন্থরা কর্তৃক কৈকেয়ীকে প্রদত্ত কুমন্ত্রণা থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তরঃ কৈকেয়ী রামকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন, এমনকি নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি। কিন্তু মন্থরা পূর্ব থেকেই রামের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। তাই যখন মন্থরা শুনল যে, পরদিন রামের রাজ্যাভিষেক হবে, সে সেটা সহ্য করতে পারল না। তখন সে কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিয়ে দশরথের কাছ হতে পূর্বে প্রাপ্ত দুইটি বর চাইতে বলল। আর কৈকেয়ী সেই কুমন্ত্রণার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি মানঘরে প্রবেশ করে অনশন করতে শুরু করেছিলেন এবং ছলে বলে কৌশলে দশরথ মহারাজ থেকে একবরে রামের ১৪ বছরের জন্য বনবাস এবং অন্য বরে ভরতকে রাজা করার জন্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিলেন। অসৎসঙ্গের এমনই প্রভাব। অসৎসঙ্গের প্রভাবে একজন ভাল ব্যক্তির মনও কলুষিত হয়ে যায় আর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিরও অনিষ্ট কামনা করে।

প্রশ্ন-৩০। দশরথ মহারাজ বহুকাল পূর্বে কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে চেয়েছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমণের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তরঃ পত্নীর কাছে প্রতীজ্ঞার পাশে আবদ্ধ পিতার আদেশ পালন ক'রে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাসস্থান এবং অন্য সব কিছু ত্যাগ ক'রে বনে গমন করেছিলেন। ঠিক যেভাবে একজন মুক্ত পুরুষ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন। মহারাজ দশরথের তিন পত্নী ছিলেন। তাদের অন্যতম কৈকেয়ীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় কৈকেয়ী দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করেন। তার পুত্র ভরতকে যেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানো হয়। পিতৃভক্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতার আদেশ শিরোধার্য করেন এবং নির্দ্বিধায় সর্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩১। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে গমন থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

উত্তরঃ ভগবান রামচন্দ্রের বনবাসে গমন থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়, এই জড় জগৎ হচ্ছে দুঃখালয়ম অশ্বাশতম। এমনকি, এখানে মহান, সৎ ও নীতিবান লোকদেরকেও অনেক যাতনা পেতে হয়। এখানে পরিস্থিতি এক রাতের মধ্যে, এমনকি এক মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদেরকে সব সময় প্রয়াস করা উচিত যাতে আমরা এই জড় জগৎ থেকে মুক্তিলাভ করে চিন্ময় জগতে, ভগবৎধামে ফিরে যেতে পারি। আর যেন এই জড় জগতে ফিরে আসতে না হয়।

প্রশ্ন-৩২। 'ভরত' শব্দের অর্থ কী? তাঁর ভরত নাম কিভাবে সার্থক হয়েছিল?

উত্তরঃ ভরত শব্দের অর্থ যিনি বিশাল ভার বহন করেন। ভরত সর্বদা সকল পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশ পালনে রত ছিলেন। কৈকেয়ী দেবী যখন রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করেছিলেন, ভরত তখন তাঁর মামার বাড়িতে ছিলেন। তিনি এইসব চক্রান্তের কিছুই জানতেন না। যখন তিনি অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন সবাই তাকে দোষারোপ করতে থাকে এবং মন্ত্রীরা তাকে রাজা হতে বলেন। ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য সমগ্র অযোধ্যাবাসীদের নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে যান। রাম ফিরে আসতে রাজী হন নাই তখন ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্র নিজের পাদুকা ভরতকে প্রদান করেন। ভরত অনিচ্ছাসত্ত্বে চৌদ্দ বছর রামের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পালনের ভারি বোঝা বহন করেন এবং রামের বিরহে, ও মায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় তীব্র তপস্যা ক'রে অতিবাহিত করেন। এইভাবে তাঁর ভরত নাম সার্থক হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩৩। শত্রুঘ্নর শত্রু কে ছিল? তাঁর নাম শত্রুঘ্ন হয়েছিল কেন?

উত্তরঃ শত্রুঘ্ন রামের মহান ভক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি সরাসরি শ্রীরামের সেবা না ক'রে রামের শুদ্ধ ভক্ত ভরতকে সেবা করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, রামকে সেবা করার চেয়েও রামভক্তকে সেবা করা আরও বেশি উত্তম। তাই তাঁর শত্রু ছিল সরাসরি রামের সেবা। শত্রুঘ্ন একটি যন্ত্রের মতো নিজেকে ভরতের কাছে সমর্পণ করেছিলেন যাতে ভরত তাঁর ইচ্ছামতো যেকোনোভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারেন। বৈষ্ণবকে সেবা করার জন্য শত্রুঘ্ন তাঁর অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য আদি শত্রুদের জয় করেছিলেন। সেজন্য তাঁর নাম হয়েছিল শত্রুঘ্ন।

প্রশ্ন-৩৪। শ্রীরামচন্দ্র রাজপুত্র ও ভগবান হয়েও গুহের সাথে, সুগ্রীবের সাথে, বিভীষণের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। এখান থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়।

উত্তরঃ এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় ভগবান জাতিভেদ, বর্ণভেদ করেন না। যদিও তিনি হচ্ছেন ভগবান, রাজপুত্র এবং একজন মহাবীর, তবুও তিনি অত্যন্ত বিনীত ও সকল জীবের প্রতি সমদর্শী। তাই তিনি শবররাজ গুহের সাথে, বানররাজ সুগ্রীবের সাথে, রাক্ষসরাজ বিভীষণের সাথে বন্ধুত্ব করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি ভেদাভেদ না ক'রে সকলকে আপন করে নিয়েছেন, সকলকে নিজের পার্ষদ হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন। এটিই হচ্ছে তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর বদান্যতা।

প্রশ্ন-৩৫। রামায়ণের কাহিনীগুলো কী কাল্পনিক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তরঃ রামায়ণের কাহিনীগুলো কাল্পনিক নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। রামসেতু আজও সাগরে বিদ্যমান রয়েছে, রাম নাম লেখা পাথর আজও ভারতের রামেশ্বরম নামক স্থানে রয়েছে যা পানিতে ভাসে। হনুমানকে বেশ কয়েক বার জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে দেখা গেছে। রামের লীলাস্থলীসমূহ যেমন—অযোধ্যা, মিথিলা, চিত্রকূট, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা ইত্যাদি সব স্থান এখনো প্রাচীন নিদর্শন ও প্রমাণসহ বিদ্যমান রয়েছে। ভারতের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে শ্রীরামের বংশপরম্পরার রাজাদের বিবরণ পাওয়া যায়। এটি প্রমাণ করে যে, রামায়ণের কাহিনীগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ বাস্তব ইতিহাস।

প্রশ্ন-৩৬। আধুনিক বিশ্বে রামায়ণ কতটা প্রাসঙ্গিক?

উত্তরঃ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের দিক থেকে আধুনিক বিশ্ব অনেক উন্নত হতে পারে। কিন্তু চরিত্র, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দিক দিয়ে আধুনিক বিশ্ব অনেক পিছিয়ে আছে। গর্ভপাত, সন্ত্রাস, নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, যুদ্ধ, সংঘাত, পরিবেশ দূষণ, কসাইখানায় গণহারে প্রাণীহত্যা ইত্যাদি অনেক সমস্যা হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। রামায়ণের উন্নত বৈদিক কৃষ্টি, নীতি, মূল্যবোধ যদি আধুনিক যুগের মানুষেরা অনুসরণ করে তাহলে এই জগতে পুনরায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তখন জগত অনেক সুখী, সমৃদ্ধিশালী হবে। তাই আধুনিক বিশ্বে রামায়ণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন-৩৭। রামায়ণের কোন্ চরিত্র অত্যন্ত আকর্ষণ করে এবং কেন?

উত্তরঃ হনুমানের চরিত্র সবচেয়ে আকর্ষণ করে। হনুমান একদিক দিয়ে শ্রবণের আচার্য, শ্রেষ্ঠ রাম ভক্ত, শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ সেবক এবং অন্যদিকে তাঁর চরিত্র ও কার্যাবলী অত্যন্ত আকর্ষণীয়, শ্রবণ মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি সংকটমোচন, মহাবলী, ব্রজাঙ্গজী, রামেষ্ট, সীতা শোক নাশন, লক্ষণ প্রাণ দাতা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। তাঁর থেকে রামের প্রিয় ভক্ত আর কেউ নেই, হবেও না। হনুমানের কৃপা হলে অবশ্যই রামভক্তি লাভ হয় এবং শ্রীরামের নিত্য ধামে সেবা অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই হনুমান হচ্ছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

প্রশ্ন-৩৮। ভ্রাতা ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন এদের গুণাবলী এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ গুণাবলী বর্ণনা কর।

উত্তরঃ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁরা জীবতত্ত্ব নন। রাম, ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন আদি বহুরূপে ভগবান বিরাজমান এবং এই সমস্ত রূপ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানরূপে নিত্য। একটি দীপ থেকে বহু দীপ প্রজ্জ্বলিত হলেও যেমন সব কয়টি দীপই সমশক্তি সম্বলিত তেমনই ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরাও সকলেই পূর্ণ শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীরামচন্দ্র, ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন বিষ্ণুতত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁরা সকলেই সমান শক্তি সমন্বিত। শ্রীরামচন্দ্র সূর্য বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রাগ-দ্বেষ মুক্ত ছিলেন। সকলকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বে মহাঋষিগণ দণ্ডক কাননে রঘুনাথে দেখিয়া গোপাল মনে পড়ে এবং মুনি কন্যা হয়ে সাধনসিদ্ধা সখী হন। সাধনসিদ্ধা সখী হয়ে রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করেন। এগুলি রামচন্দ্রের বিশেষ গুণাবলী।

প্রশ্ন-৩৯। এই জগতে স্ত্রীদেরকে রক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে রাম-সীতা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

উত্তরঃ শ্রীরামচন্দ্রের স্থিতি চিন্ময়, তিনি এই জড়জগতের অধিবাসী নন। জড়জগতে যারা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত তারা দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু চিৎ-জগতে ভগবান এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তির বিরহ ভগবানের চিন্ময় আনন্দ বর্ধিত করে। এই জড়জগতে স্ত্রী যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ স্ত্রী অরক্ষণীয়া থাকলে রাবণের মতো রাক্ষসেরা তাকে ভোগ করবে। স্ত্রীকে সবসময় রক্ষা করা উচিৎ। কারণ স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। রাবণ এতই পাপী ও নির্লজ্জ ছিল যে, সে জানতো না সীতা দেবীকে অপহরণ করার ফল কি হবে। রাবণের মতো জড়বাদীরা যেভাবে আচরণ করে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তার ফলে জড়সভ্যতার বিনাশ হয়। নাস্তিকেরা যেহেতু রাক্ষস, তাই অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করতেও সাহস করে এবং তাদের দণ্ডভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন-৪০। সীতাদেবীকে অপহরণ করার পাপের ফলে রাবণের সমস্ত পূণ্য বিনষ্ট হয়েছিল। এজন্য রামচন্দ্র শাস্তিস্বরূপ তাকে বধ করেন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তরঃ রাবণ বিশ্রবার মূত্রসদৃশ পুত্র। এখানে রাবণকে মূত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ সে ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক হয়েছিল। সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বলেছিলেন, তুমি সবচাইতে নিকৃষ্ট। আমার অনুপস্থিতিতে সীতাদেবীকে অপহরণ করেছো। আমি তোমাকে দণ্ডদান করবো। তাই আমি তোমাকে তোমার দুষ্ট কর্মের ফল প্রদান করবো। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকে শর যোজন ক'রে রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সেই বাণ রাবণের হৃদয় বিদ্ধ করেছিল। তার পাপের চরম পরিণতিস্বরূপ রামচন্দ্র তাকে বধ করেন। রাবণ কামের অধীন হয়ে সীতাদেবীর প্রভাব জানতে ব্যর্থ হন। সীতাদেবীর অভিশাপের ফলে রামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ নিহত হয়েছেন।

একপত্নী গ্রহণ করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান রাবণকে নিহত ক'রে নিজের পত্নীকে উদ্ধার করেন। পতিব্রতা নারী অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। পরস্ত্রীর প্রতি কামভাব পোষণ করা উচিৎ নয়। চাণক্য শ্লোকের নির্দেশ—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।।

"যিনি পরস্ত্রীকে মায়ের মতো দর্শন করেন, অন্যের সম্পত্তিকে মাটির ঢেলার মতো দর্শন করেন, অন্য সমস্ত জীবের প্রতি আত্মবৎ আচরণ করেন, তিনি প্রকৃত পণ্ডিত"। (আরো ব্যাখ্যা দেখ ভা.৯-১০-২৭)

Mahavarata (MV)

(ষষ্টি লক্ষ শ্লোকের মহাভারত সর্বপ্রথম মহামুনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচনা করেন। এই ষাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ দেবলোকে--পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে—চতুর্দশ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং বক্রী লক্ষ শ্লোক মর্তলোকে প্রচারিত হয় বলিয়া কথিত আছে।)

Total teaching hours-30 (40-45 periods)   Total questions-40   Total marks-200

প্রশ্ন-১। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তরঃ আধুনিক যুগে বৎসর গণনায় আমরা দেখি যে, ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর সাল গণনা পাওয়া যায়। তখন রাজা ছিলেন শুদ্ধধন, তাঁর পুত্র বুদ্ধদেব। তৎপূর্বে জগতে মানুষ ছিল, সভ্যতা ছিল। বর্তমানে দেখা যায় পূর্বের এই ইতিহাসকে অন্ধকার যুগ ব'লে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, যদিও অতি উন্নত সভ্যতা বিরাজমান ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনা ৫০০০(পাঁচ হাজার) বৎসর পূর্বের। তখন সমগ্র পৃথিবীটা ভারতবর্ষ নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং মহাভারতের ইতিহাস হচ্ছে সারা পৃথিবীর ইতিহাস। এই ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ইহাকে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ও সকল জীবনের ইতিহাস বলা যেতে পারে। উক্ত সময়ে এই পৃথিবীতে সভ্যতার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল হস্তিনাপুরকে (বর্তমানে দিল্লী শহর) কেন্দ্র ক'রে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা দেখা যায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, সারা ভারতবর্ষের তথা দ্বারকায় যদুবংশের ঘটনাবলী। এই আধুনিক যুগেও এই সকল সভ্যতার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। ব্যাসদেব অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য ধর্মীয় অনুশাসন সম্বলিত ইতিহাস ও মহাভারত রচনা করেন। বাল্মীকি মুনি ইতিহাস রামায়ণ রচনা করেন।

প্রশ্ন-২। আধুনিক যুগে মহাভারতের ভূমিকা ও ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

উত্তরঃ মহাভারত শুধু কাব্য নয়, শুধু কাহিনী বা ইতিহাস নয়, ইহা একাধারে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব। এমন কোনো জ্ঞানের বিষয় নাই যাহা মহাভারতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের মত চরিত্রবহুল গ্রন্থও আর দ্বিতীয় নাই।

প্রচীন মহাভারতের পুঁথি মোট আট প্রকারের লিপিতে পাওয়া গিয়াছে--(১) কাশ্মীরাঞ্চলে শারদা-অক্ষর। (২) মধ্য ও উত্তর ভারতে নাগরী অক্ষর। (৩) মিথিলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মৈথিল অক্ষর। (৪) পূর্ব ভারতে বাংলা অক্ষর। (৫) নেপালাঞ্চলে নেপালী অক্ষর। (৬) দাক্ষিণাত্যে তামিল অক্ষর। (৭) তেলেগু অক্ষর এবং (৮) মালয়ালাম অক্ষর। অপ্রধান ঘটনা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পার্থক্য থাকিলেও মূল কাঠামো সর্বত্রই প্রায় একই প্রকার। ভারতের বাহিরেও মহাভারতীয় কাহিনী সুদূর অতীতকাল হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। জাভা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু মহাভারতীয় চরিত্রের নামে মন্দির আছে। এমনকি আরব দেশেও বিভিন্ন প্রকার নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু প্রধান প্রধান ভাষায় এই মহাকাব্যের অনুবাদ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা মহাভারত বঙ্গানুবাদ করেছেন কাশীরাম দাস পয়ার ছন্দে। সংক্ষিপ্তভাবে গদ্যাকারে ব্যাখ্যা লিখেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য বাংলাভাষায় লেখা গ্রন্থখানার জনপ্রিয়তা সহকারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু প্রধান প্রধান ভাষায় এই মহাকাব্যের অনুবাদ হইয়াছে। মহাকবি কাশীরাম দাসের বহু পূর্বে, বাণীর বহু সাধক মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। সঞ্জয়, শঙ্কর, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, কৃষ্ণানন্দ বসু, এমন কি বঙ্গেশ্বর জেসারত সাহেবের প্রধান সেনাপতি পারগল খাঁ কর্তৃকও একখানি মহাভারত অনুদিত হয়, তাহা পারগলী-ভারত নামে খ্যাত। এই সব মহা মনীষাশালী পণ্ডিতগণ কেহ কাশীরামের কিছু পূর্বে কেহ সমসময়ে মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু মহাভারতের জন-প্রিয়তম বাংলা-অনুবাদক যে কাশীরাম দাস তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাশীরাম দাস পয়ারছন্দে পদ্যাকারে ব্যাখ্যা করেছেন।

কাশীদাসী মহাভারত বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০১ থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের (ব্যাপ্টিষ্ট) মিশন প্রেসে। কাশীদাসী মহাভারতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট এর ভক্তিবাদ। বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী ইন্দ্রাণী পরগনার সিদ্ধিগ্রামে (মতান্তরে সিঙ্গিগ্রামে) খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাসের জন্ম। তিনি মধ্যযুগীয় বাংলার অন্যতম জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কাশীরাম দাসের মহাভারত বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অদ্ভুত গৌরব লাভ করেছে।

প্রশ্ন-৪। মহাভারতের মোট কয়টি পর্ব আছে? এগুলোর নাম লিখ।

উত্তরঃ মহাভারতের মোট ১৮ (আঠারো) টি পর্ব আছে। এগুলোর নাম আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, গদাপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, ঐষিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অশ্বমেধপর্ব, আশ্রমিকপর্ব, মুষলপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব।

প্রশ্ন-৫। মহাভারতের রাজবংশে রাজাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত বিবরণে দেখা যায়, ভারতবর্ষে দুইটি রাজবংশ শাসনকার্য পরিচালনা করতো, একটি সূর্যবংশের রাজন্যবর্গ, অন্যটি চন্দ্রবংশ অর্থাৎ সোমবংশের রাজন্যবর্গ। শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা সম্বলিত ভাগবতমের ষষ্ঠ ও নবম স্কন্ধে সারণীতে বংশ তালিকায় ইহার বিবরণ আছে। এই বংশ তালিকায় দেখা যায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে বৈবশ্বত মনু ও শ্রদ্ধার বংশধরদের তালিকা এবং সূর্যবংশের বিখ্যাত রাজাদের নাম পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র, অংশুমান, দশরথ, রামচন্দ্র, কুশসহ সকল রাজন্যবর্গের নাম দেখা যায়। কলিযুগে সূর্যবংশে ভবিষ্যৎ রাজন্যবর্গের একটি নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

চন্দ্রবংশের নামের তালিকায় দেখা যায়, বিষ্ণু-ব্রহ্মা পরবর্তী অত্রি ও অনুসুয়ার বংশের তালিকা। দত্তাত্রেয় থেকে শুরু ক'রে পুরূরবা-উর্বশীর বংশধর, বিশ্বামিত্র মুনি, যমদগ্নি-রেনুকার বংশ, পরশুরাম, পুরূরবা-অত্রির বংশ, বৃষ্ণি, শ্বফল্ক, অক্রূর, উগ্রসেন, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ, কর্ণ, পাণ্ডবগণ, জরাসন্ধ, দেবাপী, শান্তনু, দূর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় রাজাদের নাম পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৬। রাজা শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তরঃ হস্তিনার রাজা শান্তনু। তিনি মহাধার্মিক, মহাধনুর্ধর, রূপবান, গুণবান, প্রজাবৎসল রাজা। একদিন তিনি গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় দেখলেন, পরমাসুন্দরী এক অশেষ রূপলাবণ্যবতী রমণী জলের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রূপমুগ্ধ শান্তনু তাঁর কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন ক'রে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। কন্যা বললেন—রাজা, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি। তবে আমার একটি শর্ত আছে। শর্ত হচ্ছে—আমার কাজের সম্বন্ধে কোনো দিন কথা বলতে পারবেন না। অথবা কাজের কৈফিয়ত চাইবেন না। কোনো দিন আমাকে তিরস্কার করবেন না। যেদিন আপনি আমাকে কুবাক্য বলবেন, কিংবা আমার কাজের কোনো কারণ জিজ্ঞাসা করবেন, মনে রাখবেন—আমি সেই দিনই আপনাকে ত্যাগ ক'রে যাব। শান্তনু স্বীকৃত হলেন এবং সেই কন্যাকে বিবাহ ক'রে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। এই কন্যা স্বয়ং গঙ্গা।

প্রশ্ন-৭। ভীষ্মদেবের জন্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

উত্তরঃ রাজা শান্তনু ও গঙ্গা বিবাহের পর পরম সুখে তাঁরা দিনাতিপাত করতে লাগলেন। কালক্রমে গঙ্গার গর্ভে রাজার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। গঙ্গা নবজাতককে নিয়ে নদীতে বিসর্জন দিয়ে এলেন। রাজা জানলেন, বাক্যবদ্ধ, কিছু বলবার উপায় নাই। প্রশ্ন করলেই তিনি পরিত্যাক্ত হবেন। এইভাবে সাতটি সন্তান বিসর্জিত হওয়ার পর অষ্টম সন্তানকে নিয়ে যাবার সময় শান্তনু স্ত্রীকে এই সন্তান বিসর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দেবী জাহ্নবী বললেন—রাজা, তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছো। অতএব এই সন্তান রইলো, আমি বিদায় নিলাম। রাজা কাতর হয়ে অনেক কাকুতিমিনতি করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। গঙ্গা চলে গেলেন। শান্তনুর এই সন্তানই মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম চরিত্র পূণ্যশ্লোক ভীষ্মদেব—দেবব্রতের যথাকলে যৌবরাজ্যে অভিষেক হলো তাঁর।

প্রশ্ন-৮। কুরুবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখ।

উত্তরঃ গঙ্গার সাথে শান্তনু রাজার বিচ্ছেদের পর সত্যবতীর সঙ্গে আবার বিবাহ হয়। কালক্রমে রাণী সত্যবতীর গর্ভে দুটি পুত্র, চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ শান্তনুর পরলোক গমনের পর চিত্রাঙ্গদের যৌবনকাল আগমন পর্যন্ত তার নামে ভীষ্মদেব রাজ্য পরিচালনা করলেন। চিত্রাঙ্গদের রাজ্য প্রাপ্তির পর চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব রাজার সঙ্গে যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হলেন। বিচিত্রবীর্য সিংহাসনে আরোহণ করলেন। ওদিকে কাশীরাজ একসঙ্গে তাঁর তিন কন্যার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন শুনে ভীষ্ম সেখানে গিয়ে কন্যা তিনটিকে নিয়ে নিজের রথে উঠে বসলেন। স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজাদের বললেন—আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য এদের নিয়ে যাচ্ছি। যদি কারোর সাহস থাকে, তবে আমাকে বাধা দিতে পারেন। কন্যা তিনটির মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বা ভীষ্মকে বললো—আমি মনে মনে শাল্য রাজাকে পতিরূপে নির্বাচন ক'রে রেখেছি। ভীষ্ম তাকে মুক্তি দিলেন। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অন্য দুই কন্যার বিবাহ হলো। কিন্তু দিবারাত্রি দুই স্ত্রী নিয়ে মত্ত থাকার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বিচিত্রবীর্য যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। বংশ-লোপের ভাবনায় আকুল হয়ে সত্যবতী ভীষ্মকে বংশ রক্ষার কথা বললেন। পরে ব্যাসদেবকে স্মরণ করলেন। অম্বিকার গর্ভে জন্মান্ধ হয়ে ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুবর্ণ পাণ্ডুর জন্ম হয়। এরপর এক দাসীর গর্ভে মহামতি বিদুরের জন্ম হয়।

প্রশ্ন-৯। পঞ্চপাণ্ডবের জন্মের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তরঃ পাণ্ডুর বিবাহ হয় যাদবংশের কন্যা কুন্তীর সঙ্গে। এই কুন্তী তার কিশোরী বয়সে সেবা ক'রে দূর্বাসা মুনিকে তুষ্ট করেছিলেন। যাবার সময় দূর্বাসা তাঁকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এই মন্ত্র জপ ক'রে যে দেবতাকে ডাকবে, তিনি এসে দেখা দেবেন। কিশোরী কুন্তী কৌতুহল বশে সূর্যদেবকে স্মরণ করায়—দিবাকর স্বয়ং আবির্ভুত হলেন এবং ভোগেচ্ছা প্রকাশ করলেন। একে বালিকা, তার উপর ভীতা। সূর্যদেব তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—ভয় নাই। এই সন্তান তোমার কর্ণ দিয়ে নির্গত হবে। সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী এই সন্তান হবে অসাধারণ বীর। তার নাম হবে কর্ণ। কর্ণের পরিচয় হলো সূতপুত্র। অধিরথের স্ত্রীর নাম রাধা। তাদের এই পালিত পুত্রের নাম হলো বসুসেন। পরে তিনি দানবীর কর্ণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অভিশপ্ত পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে কুন্তী ধর্মকে ভজনা ক'রে যুধিষ্ঠির, পবনদেবকে ভজনা ক'রে ভীমসেন, ইন্দ্রকে তুষ্ট ক'রে অর্জুনকে লাভ করলেন এবং মাদ্রী কুন্তীর কাছ থেকে জেনে এই মন্ত্র জপ ক'রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তুষ্ট ক'রে নকুল ও সহদেবকে লাভ করলেন।

প্রশ্ন-১০। পঞ্চপাণ্ডবের বনে গমনের বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ।

উত্তরঃ পাণ্ডবদের প্রতি কৌরবদের হিংসা ক্রমে বাড়তে দেখে বাধ্য হয়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং পাণ্ডবদের নিরাপদে রাখার জন্য মন্ত্রী পুরোচনকে দিয়ে বারণাবতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। সহজ দাহ্য-পদার্থের তৈরী এই প্রাসাদে তিনি সপুত্র কুন্তীদেবীকে শিবপূজার অছিলায় পাঠিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই চক্রান্ত বিদুর জানতে পেরে পাণ্ডবদের কাছে সে কথা প্রকাশ করে দিলেন। একদিন রাত্রে এক ব্যাধপত্নী তার পঞ্চপুত্রকে নিয়ে কুন্তী দেবীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলো। সেই রাত্রে ভীম, তাঁর মা ও চার ভাইকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুরোচনের ঘরে স্বহস্তে আগুন দিয়ে গেলেন। এইভাবে বনে বনে ভ্রমণের সময় মহাবীর ভীম একচক্রা নগরে এসে দূরাত্মা বক রাক্ষসকে বধ করলেন। তারপর পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্ময়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। এই সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপস্থিত ছিলেন। অপরূপা দ্রৌপদী ভাইয়ের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করলেন।

প্রশ্ন-১১। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ঘোষণা ছিল—দ্রৌপদীকে লাভ করতে হলে শূণ্যে ঘূর্ণায়মান একটি চক্রের মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে একটি স্বর্ণ মৎসের চক্ষু ভেদ করতে হবে। নিচে জলের মধ্যে মৎসের ছায়া দেখে এই লক্ষ্য ভেদ করতে হবে। কোনো ক্ষত্রিয় রাজাই এই দুঃসাধ্য লক্ষ্য ভেদে সামর্থ হলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও অঙ্গরাজ কর্ণ লক্ষ্য ভেদ ক'রে দূর্যোধনকে এই কন্যারত্ন দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখে ফিরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে সুদর্শন চক্রে লক্ষ্য ঢেকে দেওয়ায় দ্রোণ ও কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করতে অসমর্থ হলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুন অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। অর্জুনের এই সাফল্যে রাজন্যবর্গ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করলেন। ছদ্মবেশী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চোখকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেন নাই। ফলে তাঁর আশির্বাদে পার্থ সহজেই জয়ী হলেন। ক্রুদ্ধ রাজাদের পরাজিত ক'রে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীর কাছে গেলেন।

মাকে ডেকে বললেন, দেখবে এসো কি এনেছি। কুন্তী ঘরের মধ্যে ছিলেন। সেখান থেকেই বললেন যা এনেছো পাঁচ ভাই ভাগ ক'রে নাও। মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য ক'রে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করলেন। দ্রুপদ রাজা মহাসমাদরে কুন্তীদেবী ও পঞ্চপাণ্ডবকে অভ্যর্থনা করলেন।

প্রশ্ন-১২। বিরাট রাজার গোধন হরণের বিবরণ লিখ।

উত্তরঃ বিরাট রাজার অসংখ্য গরু ছিল। দূর্যোধন বিরাটরাজের সভায় কীচকের মৃত্যুর খবর শুনে বিরাটের এই গোধন অপহরণের জন্য বিরাট রাজ্য আক্রমণের পরামর্শ করলো। উদ্দেশ্য রাজ্যগ্রাস ও গোধন অপহরণ। এদিকে দূর্যোধন রাজা সুশর্ম্মাকে আজ্ঞা দিলেন বিরাটের গোধন হরণ করতে। সুশর্ম্মা মৎসদেশে প্রবেশ ক'রে সৈন্যদলকে আদেশ করলেন গোহরণের জন্য। সুশর্ম্মা বিরাট রাজ্যে প্রবেশ ক'রে রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করলেন। বন্দী বিরাট রাজাকে নিয়ে সুশর্ম্মা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, এই অন্যায় দেখা উচিত নয় ভাই। তুমি যাও বিরাটকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এসো। ক্রুদ্ধ ভীমসেন যুদ্ধক্ষেত্রে কালান্তক যমের মত জ্যেষ্ঠের আদেশে সুশর্ম্মাকে আক্রমণ ক'রে এবং তার বিশাল বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে বিরাট রাজাকে মুক্ত করলেন। অন্যদিকে দূর্যোধন—ভীম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন প্রভৃতিকে নিয়ে বিরাট রাজ্যে আক্রমণ করলেন। বিরাটের পুত্র উত্তর ছিল সেই গোসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাছে সৈন্য-সামন্ত না থাকায় সে গরু রক্ষা করতে পারলো না।

প্রশ্ন-১৩। কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা দূর্যোধনকে দেন। এ বিষয়ে বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ভীষ্ম দ্রোণ সবাই দূর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের দিতে। কিন্তু মদান্ধ দূর্যোধন সে কথা শুনলেন না। বললেন, বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। মহামন্ত্রী বিদুর অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিলেন, মহারাজ পুত্রকে আদেশ করুন পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিতে। নইলে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে কুলক্ষয় হবে। সর্বনাশ হবে মহারাজ। পুত্র-স্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্র দূর্যোধনকে নিষেধ করতে পারলেন না। দূর্যোধন তার অনুগত রাজগণকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ ক'রে পাণ্ডবদের বিপক্ষে বিরাট যুদ্ধসজ্জা করতে লাগলেন। পাণ্ডবেরা চার ভাই যুদ্ধসজ্জার জন্য বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের অনুমতি চাইলেন। তিনি অনেক ইতস্ততঃ ক'রে অবশেষে অনুমতি দিলেন। দূর্যোধন উলূককে পাঠালেন, দূর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনার জন্য স্বয়ং দ্বারকায় গমন করলেন। কিন্তু কৌশল ক'রে শ্রীকৃষ্ণ দূর্যোধনকে নারায়ণী সেনা দিয়ে সন্তুষ্ট ক'রে নিজে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করলেন।

প্রশ্ন-১৪। যুদ্ধের প্রথম সেনাপতি হলেন ভীষ্ম। এ বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ বিশাল কুরুক্ষেত্রে নিজ নিজ সৈন্য সমাবেশ করলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রথম সেনাপতি হলেন, কৌরবপক্ষে গঙ্গার নন্দন মহাবীর ভীষ্ম। ভীষ্ম দূর্যোধনকে বললেন—বৎস, আমার পূর্ব প্রতীজ্ঞা স্মরণ করো। আমি যতদিন কুরু-সেনাপতি থাকবো এবং যুদ্ধ করবো, ততদিন সূতপুত্র কর্ণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে না আসে এবং অস্ত্রধারণ না ক'রে। আমি দশ দিন যুদ্ধ করবো। দূর্যোধন সম্মতি দিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের কথা শুনে চিন্তিত মনে সিংহাসনে বসে ছিলেন। এমন সময় ঋষি দ্বৈপায়ণ প্রবেশ করলেন। রাজা মুনির চরণ বন্দনা করলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। ঋষিবর আসন গ্রহণ করলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে যুদ্ধের কথা বললেন। প্রশ্ন করলেন, কেন এই সর্বনাশ হলো দেব? তখন দ্বৈপায়ণ বললেন, ব্রহ্মার কাছে গিয়ে পৃথিবী নিবেদন করেছেন, তিনি আর এই ধরার ভার বহণ করতে পারছেন না। তাই এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। সেই জন্য কলি অবতার তোমার পুত্র দূর্যোধনরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। দেখ চারিদিকে কত অমঙ্গল চিহ্ন। দিনে শিয়াল ডাকছে। আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। দিনে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন-১৫। যুদ্ধের ঘটনাবলী দেখার জন্য সঞ্জয় বিবরণ দেওয়ার দায়িত্ব পান। এ বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তিনি এই মহাসমর দেখতে পাবেন না বলে আক্ষেপ করতে ব্যাসদেব দয়াপরবশ হয়ে সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দান ক'রে বললেন—দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে তুমি ঘরে বসেই এই মহাযুদ্ধ দেখতে পাবে। তুমি যেমন যেমন দেখবে তেমনই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করবে। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ডেকে বললেন খুব সাবধানে যুদ্ধ করো ভাই। আমাদের সৈন্য অল্প, কৌরবদের অসংখ্য। ধনঞ্জয় হেসে বললেন, সংখ্যায় বেশী হলে শক্তিতে বেশী হয় না মাহরাজ। কুরুবংশ নিশ্চয় ধ্বংস হবে। স্বয়ং কৃষ্ণ আমাদের পক্ষে সহায়।

প্রশ্ন-১৬। যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার উপদেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

উত্তরঃ যুদ্ধ করতে এসে অর্জুন বিষাদ-মগ্ন হলেন। তিনি বললেন, হে কৃষ্ণ! এই স্বজন বধ, জ্ঞাতিবধ কি করতেই হবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই সংসার ও জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে অনেক অমূল্য উপদেশ দিলেন। যে অমৃতবাণী শ্রীমদভগবদ্‌গীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন--মিথ্যাই তুমি বলছো, তুমি বধ করবে। "সয়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব"। আমি আগেই এদের বধ ক'রে রেখেছি। এই বলে ভগবান সখা অর্জুনকে আপন বিশ্বরূপ দর্শন করালেন।

প্রশ্ন-১৭। ভক্তের জন্য কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। ভীষ্মদেবের ইচ্ছা পূরণের বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ ভীষ্ম পঞ্চবাণ দূর্যোধনের হাতে দিলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে দর্শন দিলেন। ভীষ্ম সবই বুঝলেন। বললেন, ছলনা ক'রে অস্ত্র অপহরণ করলে দয়াময়। তাহলে শোন! এই যুদ্ধে তুমি অস্ত্র ধরবে না প্রতিজ্ঞা করেছো। আগামীকালের যুদ্ধে তোমার সেই প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙবো। তাই হলো। পরের দিন ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত বাণ এসে কৃষ্ণের গায়েই যেন বেশী ক'রে পড়তে লাগলো। তুমুল যুদ্ধে পাণ্ডব সৈন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। অর্জুন ভীষ্মের বাণাঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বহু সৈন্য ক্ষয় হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তান্বিত হয়ে ক্রোধে রথ হতে লাফিয়ে নিচে পড়ে থাকা একটা ভগ্ন রথচক্র নিয়ে ভীষ্মকে বধ করতে বেগে ধাবিত হলেন। ভীষ্মদেব ধনুর্বাণ পরিত্যাগ ক'রে জোড় হাতে বললেন, পূর্ণ হলো প্রতিজ্ঞা আমার।

প্রশ্ন-১৮। ভীষ্মের শরশয্যা বিষয়ে বর্ণনা লিখ।

উত্তরঃ ভীষ্মকে পরাজিত করতে না পেরে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি নপুংসক শিখণ্ডীকে অর্জুনের সামনে রথে এনে বসালেন। তাকে দেখামাত্র ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। অর্জুন নিরস্ত্র ভীষ্মকে পরাজিত করলেন। ভীষ্ম সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে শরশয্যা গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন-১৯। যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যের ব্যূহ রচনা সম্পর্কে লিখ।

উত্তরঃ ভীষ্মের পর কুরু সেনাপতি হলেন আচার্য মহাবীর দ্রোণ। দ্রোণও যথাশক্তি যুদ্ধ করতে লাগলেন। একদিন অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে দূর্যোধন খেদোক্তি করলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। বললেন, আমার সব সৈন্য প্রায় নির্মূল হয়ে গেল। যদি কর্ণকে সেনাপতি করতাম, তবে হয়তো এতো লোকক্ষয় হতো না। এই কথা শুনে দ্রোণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মাণ। আমাকে সেনাপতি করো না। যাইহোক আমি পদত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। শকুনিকে নিয়ে দূর্যোধন তখন গুরুর চরণে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মাণের ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শিষ্যের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে দ্রোণাচার্য বললেন, বেশ আমি যুদ্ধ করবো। এমন অপূর্ব ব্যূহ রচনা করবো যার কথা চিরকাল মানুষ সভয়ে স্মরণ করবে। এই বলে গুরু দ্রোণাচার্য চক্র-ব্যূহ রচনা করলেন। ব্যূহ মুখে রইলো জয়দ্রথ। তার পিছনে গুরু দ্রোণ। দুপাশে কর্ণ আর অশ্বথামা। ব্যূহের মধ্যে দূর্যোধন তার পিছনে কৃপ, শল্য ও ভগদত্ত।

প্রশ্ন-২০। জয়দ্রথ বধের বিবরণ দাও।

উত্তরঃ সেদিন আচার্যের সাথে যুদ্ধে পাণ্ডবদের সবাই পৃষ্ঠপোষণ করলেন। অর্জুন কাছে নেই। দ্রোণাচার্য নির্মিত এই ব্যূহ প্রবেশের কৌশল কেউ জানে না। তখন অভিমন্যুই সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাবেন। অভিমন্যু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ব্যূহ ভেদ ক'রে প্রবেশ করে। তখন সপ্তরথীর হাতে অভিমন্যুর বধ হলো। কুরুপক্ষের বড় বড় রথীরা জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে সূর্যকে আচ্ছাদন করলেন। জয়দ্রথ প্রকাশ্যে এলো। জয়দ্রথ অগ্নিকুণ্ডের কাছে আসামাত্র কৃষ্ণ সুদর্শন সরিয়ে নিলেন। হঠাৎ সূর্যের পুনঃপ্রকাশ ঘটলো। আর পালাবার পথ নাই জয়দ্রথের। অর্জুন তাকে বধ করলেন।

প্রশ্ন-২১। ব্রহ্মশাপে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। এ বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরু সেনাপতি হলেন কর্ণ। মহাবীর কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষের যে কেউ যুদ্ধ করতে যায় সেই পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। কর্ণের সারথি শল্য, তিনিও যুদ্ধ বিশারদ। যদিও কবচকুণ্ডলহীন কর্ণ, তবুও রণে তিনি অপরাজেয়। অসম্ভব কৌশল তাঁর যুদ্ধে। পাণ্ডবপক্ষের এক এক জন বীর কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আসে আর কৌরবপক্ষে উল্লাসধ্বনি উঠে। অর্জুন এগিয়ে এলেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হলো দুজনের মধ্যে। হঠাৎ ব্রহ্মশাপ অনুযায়ী কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গেল। সেই চাকা তুলবার জন্য যত চেষ্টা করেন কর্ণ, চাকা ততই মাটিতে বসে যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কর্ণকে বাণ বিদ্ধ করতে লাগলেন। মহাবীর কর্ণের মৃত্যু হলো।

প্রশ্ন-২২। শল্যের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কৌরবপক্ষের সেনাপতি হলো শল্য। প্রথম যুদ্ধ হলো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। দুজনেই সমযোদ্ধা। কেউ কারোর চাইতে হীন নন। অসিমুখ বাণ মেরে শল্য যুধিষ্ঠিরকে দূর্বল ক'রে ফেললেন। ভীম এগিয়ে এলেন। শল্য বাণ মেরে ভীমের কবচ কেটে ফেললেন। শল্যের বাণে ভীমসেনকে জর্জরিত দেখে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, অগ্রসর হয়ে এবার শল্যকে বধ করুন। কৃষ্ণের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠির শল্যের বুকে বাণ মারলেন। রণক্ষেত্রে শল্যের পতন হলো।

প্রশ্ন-২৩। দূর্যোধন ও ভীমসেনের গদাযুদ্ধের বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ দূর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে গদার প্রহারে জলরাশি বিদীর্ণ ক'রে হ্রদের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। সংবাদ পেয়ে অশ্বথামা, কৃতবর্ম্মা আর কৃপাচার্য হ্রদের তীরে গিয়ে জল থেকে উঠে আসার জন্য দূর্যোধনকে অনুরোধ করলেন। ঘটনাক্রমে এক ব্যাধ পাখী শিকার করতে গিয়ে হ্রদে লুকানো দূর্যোধনের খবর জানতে পেরে যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে সংবাদ দিল। ভীমসেন শুনে বললেন, ভালই হয়েছে। আমি যাচ্ছি দ্বৈপায়ন হ্রদে দূরাত্মাকে বধ করতে। আনন্দিত মনে কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবেরা হ্রদের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীম আর দূর্যোধনের তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। বলরাম এই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন। কেউ কারোর চাইতে শক্তিতে কম নন। ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যুদ্ধের সময় তিনি দূর্যোধনের উরু চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন। ভীম ভীমবেগে দূর্যোধনের উরুতে গদাঘাত করলেন। দূর্যোধন পড়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ ভীম এগিয়ে দূর্যোধনের মাথায় বাম পদাঘাত করলেন।

প্রশ্ন-২৪। গদাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ দূর্যোধনের আহত হওয়ার পর আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন যুধিষ্ঠির। ভাইকে তিরস্কার করলেন তিনি। তারপর দূর্যোধনের কাছে গিয়ে কেঁদে বললেন--কেন ভাই এ কাজ করলে! নিজে মরলে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-কুটুম্ব-স্বজন সবাইকে মারলে। ইন্দ্রের মত তেজস্বী তুমি, রাজ-রাজেশ্বর, আজ মাটিতে পড়ে আছ। মাত্র পাঁচখানি গ্রাম আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি শকুনির পরামর্শে তাও তুমি দিলে না। এই বলে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন যুধিষ্ঠির।

প্রশ্ন-২৫। অন্যায় যুদ্ধে বলরামের ক্রোধ সম্বন্ধে লিখ।

উত্তরঃ অন্যায় যুদ্ধে বলরাম রেগে গিয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন, অন্যায় যুদ্ধে দূর্যোধনকে ভূপাতিত করেছে ভীম। আমি ভীমকে হত্যা করবো। এই বলে তিনি হল হাতে নিয়ে ভীমকে হত্যা করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, দাদা দূরাচার দূর্যোধনের পতনের জন্য আপনার এই ক্রোধ শোভন নয়। মনে ক'রে দেখুন, একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় টেনে নিয়ে কিভাবে অপমান আর লাঞ্ছনা করেছিল দূর্যোধন। নিজের উরুর উপর ভ্রাতৃবধূকে বসাতে চেয়েছিল। পাতকীর উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। ক্ষুদ্ধচিত্তে বলরাম দ্বারকায় চলে গেলেন।

প্রশ্ন-২৬। অশ্বথামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করে। এ বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ রাজা দূর্যোধনের দুর্দশা দেখে অশ্বথামা গর্জন ক'রে বললেন, আমি পৃথিবী পাণ্ডব শূণ্য করবো। অশ্বথামাকে সেনাপতি পদে বরণ করা হলো। রাত্রিকালে অশ্বথামা চললেন পাণ্ডবদের নিধন করতে। কৃপাচার্য বললেন, নিদ্রিত মানুষ হত্যা করা মহাপাপ। এ কাজ করো না। তাছাড়া নারায়ণ স্বয়ং পাণ্ডবদের রক্ষা কর্তা। কাজেই তুমি চেষ্টা করলেও তাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। ক্রুদ্ধ অশ্বথামা কৃপকে বললেন, দূর্যোধন আমার অন্নদাতা। তার উপকার আমার করা উচিত। এই বলে উন্মাদের মত অশ্বথামা শিবির থেকে বেরিয়ে গেলেন। উপস্থিত হলেন গিয়ে নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরের দ্বারে।

অবাক হয়ে দেখলেন, শিবির দ্বারে একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীর তিনটি চোখ। পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম্ম, গলায় হাড়ের মালা। তিনি বাধা দিলেন। অশ্বথামা বললেন, পথ ছাড় আমি ভিতরে যাব। অশ্বথামা বললেন, কে তুমি। আমি বিশ্বনাথ। শিব নিজের খড়গখানি অশ্বথামাকে দিলেন। অশ্বথামা সেই খড়্গ নিয়ে শিবিরে ঢুকে নিদ্রিত পাঁচটি পুত্রকে অন্ধকারে দেখে তাদের মাথা কেটে বস্ত্রে বেঁধে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

প্রশ্ন-২৭। অশ্বথামার অস্ত্রের আঘাতে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষার বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ ক্রুদ্ধ ভীম চললেন অশ্বথামা বধে। অশ্বথামা তখন বাণ নিয়ে মন্ত্র পড়ে, "পৃথিবী নিষ্পাণ্ডবা করো" বলে বাণ ত্যাগ করলেন। মনে মনে অর্জুন গুরুকে নমস্কার ক'রে বাণ ছাড়লেন। সৃষ্টি ধ্বংস হবে ভেবে নারদ ও ব্যাসদেব দুটি বাণের মধ্যে দুজনে গিয়ে প্রবেশ করলেন। উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর যে সন্তান আছে সেই সন্তানকে বিনাশ করুক এই অস্ত্র। অতঃপর ব্যাসের বাক্যে অশ্বথামা নিজের মাথায় অস্ত্র বসিয়ে সেই সুদুর্লভ মনি কেটে অর্জুনের হাতে দিলেন। অশ্বথামার নিক্ষিপ্ত বাণে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হলো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাকে পুনর্জীবন দান করলেন।

প্রশ্ন-২৮। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ স্বজন বধের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইলেন যুধিষ্ঠির। বললেন—হে মুনি, কি করলে এই মহাপাপ থেকে মুক্তি পাব? ব্যাসদেব বললেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করো। এই বলে তিনি বিস্তারিতভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম কানুন ও তত্ত্ব যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, ভীম যাবে ঘোড়ার সঙ্গে। সঙ্গে যাবে বৃষকেতু ও মেঘবর্ণ। বৃষকেতু কর্ণের পুত্র। মেঘবর্ণ ঘটোৎকচের পুত্র। সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়া আছে রাজা যুবনাশ্বের পুরীতে। ভীমকে যুদ্ধ ক'রে সেই ঘোড়া আনতে হবে। কৃষ্ণ বললেন, ভীম সেই ঘোড়া নিয়ে আসতে পারবে না। যুবনাশ্ব মহারাজ মহা বলবান। আমিই আনবো বলে ভীম অর্জুনকে বললেন, তুমি রাজার কাছে থাকো তাঁর রক্ষাকর্তা হয়ে। এই বলে ধর্মরাজকে প্রণাম ক'রে ভীমসেন বৃষকেতু ও মেঘবর্ণকে নিয়ে অশ্ব আনতে চললেন।

প্রশ্ন-২৯। সুধন্নার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ দিগ্বিজয় করতে করতে যজ্ঞ অশ্ব হংসধ্বজ রাজার নগরে গিয়ে উপস্থিত হলো। রাজার দুই পুত্র সুধন্না ও সুরথ। অশ্বের সঙ্গে অর্জুন এসেছেন শুনে রাজা পরম প্রীত হয়ে বললেন, যেখানে অর্জুন সেখানেই কৃষ্ণ। আজ নারায়ণ দর্শন করবো। এই বলে তিনি সেনাপতি ও সৈন্যদের আদেশ দিলেন, অর্জুনকে ধরে নিয়ে এসো। যজ্ঞ অশ্বকে ধরে বেঁধে রাখো। রাজপুত্র সুধন্না যুদ্ধে গেলেন। তিনি মহাবীর। নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অর্জুন এগিয়ে গেলেন সুধন্নার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সুধন্না বললেন, তোমার রথের সারথী কৃষ্ণ কই? ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুন যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু দেখলেন সুধন্না অনেক বেশী কৌশলী ও যুদ্ধে নিপুণ। অর্জুন মহাভয়ঙ্কর তিনটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। সুধন্না কৃষ্ণ নাম স্মরণ ক'রে বাণ তিনটি কেটে ফেললো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। ভূমিতে পতিত সেই বাণ অকস্মাৎ উপরে উঠে সুধন্নার মাথা কেটে ফেললো। সুধন্নার কাটা মাথা মাটিতে পড়ে কৃষ্ণ নাম করতে লাগলো। গরুড় এসে ওই মাথা নিয়ে যাবে প্রয়াগে বিসর্জন দিতে। কিন্তু গরুড়ও পারলেন না। শিব ভক্ত সুধন্নার মাথা মহাদেবের বৃষ এসে নিয়ে গেল। দেবাদিদেব মহাদেব সেই মুণ্ডকে নিজের মালার সঙ্গে গলায় পরলেন।

প্রশ্ন-৩০। মণিপুরে বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের বিবরণ লিখ।

উত্তরঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ছুটতে ছুটতে গেল মণিপুরে। রাজা বভ্রুবাহনের অনুচররা গিয়ে ঘোড়া আটক করলো। ঘোড়ার কপালে লিখন পড়ে জননী চিত্রাঙ্গদাকে গিয়ে বললো—মা, রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। সেই ঘোড়া আমার রাজ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। আমি ধরেছি সেই অশ্ব। তুমিতো বলো—অর্জুন আমার পিতা, আমি কোনো দিন পিতার মুখ দেখিনি। না জেনে যজ্ঞের অশ্ব ধরে ফেলেছি। বল, কি করবো? চিত্রাঙ্গদা সব কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধে বভ্রুবাহনের সঙ্গে প্রতিটি যোদ্ধা পরাজয় বরণ করলেন। গাণ্ডীব নিয়ে অর্জুন গেলেন যুদ্ধ করতে। এরপর দুজনের মধ্যে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। তূণে যেসব ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছিল, অর্জুন সব প্রয়োগ করলেন। বভ্রুবাহন ধনুকে গঙ্গা অস্ত্র যোজনা করলেন। সে অস্ত্র ছুটে গিয়ে দেহ থেকে অর্জুনের মস্তক বিছিন্ন ক'রে মাটিতে ফেললো। উলূপী তখন চিত্রাঙ্গদাকে বললেন, কোনো চিন্তা করো না বোন! আমি পাতাল থেকে অমৃত মণি এনে অর্জুনকে বাঁচাবো। পুত্রেরই কৃপায় মণিসংস্পর্শে পুনর্জীবন পেলেন অর্জুন।

প্রশ্ন-৩১। ধৃতরাষ্ট্রের অবসরে যাওয়ার বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ কুরুক্ষেত্রের আত্মীয় বিনাশ পর্ব শেষ হলে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সস্ত্রীক বনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে নিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর কাতর কণ্ঠে তাকে গৃহে থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। তখন পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীও ধৃতরাষ্ট্রের সাথে বনে যাবেন বললেন। শোকার্ত হয়ে উঠলেন পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই। দ্রৌপদী কাঁদতে লাগলেন। কুন্তীদেবী তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে নকুল ও সহাদেবকে বধূ দ্রৌপদীর হাতে সমর্পন ক'রে বললেন, আজ থেকে এদের ভার তোমার উপর। গঙ্গার পশ্চিম তীরে দ্বৈপায়ণ নামে বনে কুটীর নির্মিত হলো। সেখানে বিদুর আর সঞ্জয় সবাইকে নিয়ে এলেন। অপূর্ব রমণীয় এই কাননে চিরশান্তি বিরাজিত। ধৃতরাষ্ট্র সেখানে নিজের আশ্রম নির্মাণ করলেন। যুধিষ্ঠির সকল আত্মীয়সহ সেখানে দেখা করতে এলেন। বিদুরের খোঁজ করতে শোনা গেল তিনি আজ চারদিন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে আছেন।

প্রশ্ন-৩২। যদুবংশ নাশের বিবরণ সংক্ষেপে লিখ।

উত্তরঃ গান্ধারী অভিশাপ দিয়েছিলেন কৃষ্ণকে। বলেছিলেন—তুমি যেমন আমার বংশ নাশ করলে, তেমনি তোমার যদুবংশ ধ্বংস হবে। কৃষ্ণের অনুরোধে বসুদেব এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। যাদব বালকেরা শাম্বের পেটের উপর একটি মুষল রেখে গর্ভবতী এটা প্রমাণ করলো। তারপর তাকে মুনিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো কতদিন পরে প্রসব হবে, যদি দয়া ক'রে বলে দেন। আমরা অভিশাপ দিচ্ছি, যে মুষল দিয়ে ওর গর্ভপ্রদর্শন করেছো, সেই মুষল হতেই তোমাদের যদুবংশ ধ্বংস হবে। কৃষ্ণ সব জানতে পেরে বললেন, চিন্তা করো না। এখনি এই মুষলটি নিয়ে প্রভাসের তীরে যাও। তারপর একটি পাথরে ঐ মুষলটিকে নিয়ে ঘষে ঘষে শেষ করে ফেলো। পরে কৃষ্ণ যাদব সন্তানদের নিয়ে প্রভাসের তীরে গেলেন আনন্দ করতে। একদিন সাত্যকির সঙ্গে কৃষ্ণের ঘোর তর্ক শুরু হলো। কৃষ্ণের অভিযোগ শুনে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে বারুণী (সুরা) পান

করেছিল। কৃষ্ণকে গালাগালি দিতে লাগলো। কৃতবর্ম্মা উত্তেজিত হয়ে খড়্গ নিয়ে সাত্যকিকে কাটতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি পক্ষ হয়ে গেল। দুইপক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধে যাদব বংশ ধ্বংস হলো। বলরাম যোগাসনে বসে দেহত্যাগ করলেন।

প্রশ্ন-৩৩। পঞ্চ পাণ্ডবের অবসর গ্রহণ পরবর্তী স্বর্গারোহণের বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর মৃত্যুর বর্ণনা লিখ।

উত্তরঃ উত্তরমুখে চললেন পাণ্ডবেরা। পথে এক ভীষণা রাক্ষসী তাঁদের পথ আটকালো। ভীম অবলীলাক্রমে রাক্ষসীকে নিপাত করলেন। পুনরায় পাণ্ডবগণ এলেন ভদ্রকালী পর্বতে। এখানকার কালীমূর্তি ভদ্রকালী নামে প্রসিদ্ধা। কালী বললেন, যুধিষ্ঠির বর প্রার্থনা করো। ধর্মরাজ জোড় হাতে বললেন, দেবী! এই বর দাও যে কলিকালে তুমি জাগ্রত থাকবে। দেবী বললেন, তথাস্তু। এরপর তাঁরা হরিপর্বতে এলেন। এইখানে হিমশীতলতায় দ্রৌপদী কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহ ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃতদেহ কোলে নিয়ে পাঁচ ভাই বিলাপ করতে লাগলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন—ধর্মরাজ, কোন্ পাপে দ্রৌপদীর মৃত্যু হলো? ধর্মরাজ বললেন, পঞ্চস্বামীর মধ্যে পার্থের প্রতি পাঞ্চালীর আকর্ষণ বেশী ছিল। এই পাপে দ্রৌপদীর মৃত্যু হলো।

প্রশ্ন-৩৪। স্বর্গারোহণ যাত্রায় সহদেবের মৃত্যুর বিষয়ে লিখ।

উত্তরঃ কিছুকাল বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হলো। এবার বদ্রিকাশ্রমে সহদেবের মৃত্যু হলো। ভীম প্রশ্ন করলেন, কোন্ পাপে সহদেব চলে গেল? যুধিষ্ঠির বললেন, জ্যোতিষীরূপে ভাই সহদেবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই জানা ছিল। পাশা খেলায় আমার হার হবে জেনেও সে আমাকে সাবধান করেনি। বারণাবতে আমাদের পুড়িয়ে মারা হবে এ কথা সে জানতো। জেনেও সে আমাদের সতর্ক করেনি। এই তার পাপ।

প্রশ্ন-৩৫। অর্জুন ও নকুলের মৃত্যুর বিবরণ লিখ।

উত্তরঃ পাণ্ডবেরা এলেন চন্দ্রকালী পর্বতে। এখানে নকুলের মৃত্যু হলো। পরবর্তী বিশ্রামস্থল নন্দীঘোষ পর্বতে অর্জুন তনুত্যাগ করলেন। ভীমের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বললেন—কর্ণের সাথে যখন আমার যুদ্ধ হয়, তখন নকুল আমার কাছে ছিল। যখন আমি যুদ্ধ ক'রে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, তা দেখেও নকুল আমার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। এই তার পাপ। আর অর্জুনের পাপ হলো, সে আমাকে যেরকম ভালোবাসতো তার চাইতেও বেশী ভালোবাসতো দ্রৌপদীকে। আর সব কিছুকে সে হেয় জ্ঞান করতো। এই ছিল তার পাপ।

প্রশ্ন-৩৬। স্বর্গারোহণে ভীমের দেহত্যাগের বর্ণনা লিখ।

উত্তরঃ চলতে চলতে এরপর সোমেশ্বর পর্বতে মৃত্যুবরণ করলেন ভীমসেন। হাহাকার ক'রে বিলাপ করতে লাগলেন ধর্মরাজ। এক এক ক'রে স্মরণ করতে লাগলেন ভীমের বীরত্ব কাহিনী। তারপর তাঁর মনে হলো, ভীমের মৃত্যু হলো কেন? কি ছিল তার পাপ। ধর্মরাজের মনে পড়লো, পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যবস্তুর উপর প্রচন্ড লোভ ছিল ভীমসেনের। ভক্ষ্যদ্রব্য দেখলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। লোভই হলো তার মৃত্যুর কারণ।

প্রশ্ন-৩৭। স্বর্গারোহণে যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে বর্ণনা লিখ।

উত্তরঃ অন্য সকলের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির একা। ধীরে ধীরে তিনি স্বর্গের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। গন্ধর্বপর্বত আরোহণের সময় হিমালয়বাসী মুনি-ঋষিগণ এক এক ক'রে এসে দেখা ক'রে যেতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির প্রত্যেককে প্রণাম ক'রে আশির্বাদ প্রার্থনা করলেন। এরপর ধর্মরাজ যমের পরিচয় পেয়ে যুধিষ্ঠির তার চরণে পড়লেন। ধর্মরাজ বললেন—বৎস, তুমি আমার পুত্র। আমার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তোমার জন্ম। ততক্ষণে পাশে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ইনি দেবরাজ ইন্দ্র। ইনি রথ নিয়ে এসেছেন, তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। পদব্রজে অনেক ক্লেশ সহ্য করেছো পুত্র। এবার রথে আরোহণ করো। দেবরাজের ইঙ্গিতে সারথী রথ নিয়ে এলো। সকলে তাতে আরোহণ ক'রে স্বার্গাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

প্রশ্ন-৩৮। যমরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই সংসারে সবচেয়ে আশ্চার্যজনক বস্তু কি?

উত্তরঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্ ।
শেষাঃ স্থাবরম্ ইচ্ছন্তি কিম্ আশ্চর্যম্ অতঃ পরম্ ।।

প্রতিক্ষণ লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ জীবেরা নিজেদের মৃত্যুহীন বলে মনে করে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না। এই সংসারে এটিই সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়। সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হয় কারণ সকলেই সর্বতোভাবে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই মনে করে যে, সে স্বাধীন, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, তার কখনো মৃত্যু হবে না এবং চিরকাল বেঁচে থাকবে।

প্রশ্ন-৩৯। যুক্তি-তর্কের দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানা যায় না। এ বিষয়ে মহাভারতে লিখিত বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। (ভীষ্মপর্ব-৫/২২)

যে সমস্ত নৈয়ায়িক কেবল যুক্তি ও তর্কের প্রমাণকেই প্রমাণ বলে মনে করে, তারা যুক্তি-তর্ক ছাড়া পরমতত্ত্বকে স্বীকার করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, এই সমস্ত তার্কিকেরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা গ্রহণ না ক'রে এই পথ অবলম্বন করে, তখন তারা যুক্তিতর্কের স্তরেই থেকে যায় এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। কিন্তু কোনো যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ যদি তার যুক্তি-তর্কের মূল বৃত্তিকে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা চিন্ময়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে ব্যবহার করেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, জাগতিক যুক্তির সীমিত জ্ঞানের দ্বারা পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, যা হচ্ছে সমস্ত জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত অধোক্ষজ বস্তু। যা কল্পনা অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত, তর্কের দ্বারা তাকে কিভাবে জানা যাবে? চিন্ময় স্তরে যুক্তি-তর্কের পরিধি অত্যন্ত সীমিত এবং চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়ে যদি তার প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা সর্বদাই ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। জড় যুক্তির প্রয়োগের পরমতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সর্বদাই ভ্রান্ত হয়। সেভাবেই পরতত্ত্বের সিদ্ধান্তের ফলে অধঃপতিত হয়ে পরজন্মে শৃগাল-শরীর প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তা হলেও কেউ যদি যথার্থই যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন বিচার করতে উৎসুক হন, তিনি তা করতে পারেন।

প্রশ্ন-৪০। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে যাজপুরে যজ্ঞ করার বিষয়ে লিখ। (বনপর্ব, ১১৪ অধ্যায়)
উত্তরঃ

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ।
অত্র বৈ ঋষয়োনন্যে চ পরা ক্রতুভিরীজিরে।।

যাজপুর উড়িষ্যার একটি অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এটি বৈতরণী নদীর তীরে কটক জেলার একটি মহকুমা। পূর্বে মহর্ষিরা বৈতরণী নদীর উত্তর পাড়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাই এই স্থানটির নাম যাজপুর—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের স্থান। কারও কারও মতে এই স্থানটি মহারাজ যযাতির রাজধানী ছিল; ‘যযাতি নগর’ থেকে ‘যাজপুর’ নাম হয়েছে। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে, এই স্থানে ঋষিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।। এখানে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি আছে; তার মধ্যে শ্রীবরাহদেবের মূর্তি বিশেষ পূজ্য। শক্তির উপাসকেরা ‘বারাহী’ ও ‘ইন্দ্রানী’ প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করেন। আবার, অনেকগুলি শিব মূর্তি ও দশাশ্বমেধ ঘাট আছে। এই স্থানকে ‘নাভিগয়া’, ‘বিরজা-ক্ষেত্র’ প্রভৃতিও বলা হয়।

Sanskrit Language (SL)

(সংস্কৃত ভাষাকে “দেবনাগরী” ভাষাও বলা হয়। দেব-দেবীরা এই ভাষায় কথা বলেন। দেব-দেবীরা বাস করেন যে নগরে, তার নাম স্বর্গলোক। দেব-দেবীদের নগরের ভাষা, সেজন্য ইহাকে দেবনাগরী ভাষা বলে। অক্ষরগুলির পরিচয় দেবনাগরী অক্ষর।)

Total teaching hours-20 (25-30 periods)   Total questions-30   Total marks-50

১৫নং প্রশ্নসহ যে কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১০X৫=৫০

[Answer any ten questions including question No. 5] 10x5=50

১. যে কোন দুইটির উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
[Define and illustrate any two of the following.]
প্রকৃতি, প্রাতিপদিক, ধাতু, পদ, গুণ, সবর্ণ।

২. বর্ণ কাকে বলে? সংস্কৃতে বর্ণ কয়টি ও কি কি?
[What is Barṇa? How many kinds of Barṇa are there in Sanskrit and what are they?]

৩. সকল বিভক্তি ও বচনে ‘মুনি’ অথবা ‘গো’ শব্দের রূপ লিখ।
[Decline ‘Muni’ or ‘Go’ in all vibhaktis and numbers.]

৪. সকল পুরুষ ও বচনে ‘গম্’ অথবা ‘বদ্’ ধাতুর লট্ এর রূপ লিখ।
[Conjugate the root ‘Gam’ or ‘Bad’ in Lat in all persons and in all numbers.]

৫. কারক কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?
[What is called Karaka? How many kinds of it are there and what are they?]

৬. শ্রী রামচন্দ্রের জীবনী সংক্ষেপে লিখ।
[Briefly write the biography of Sri Ramachandra.]

৭. মদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা কর।
[Discuss, in brief, the subject-matter of the first chapter of the Śrīmad Bhagavad Gītā.]

৮. নিম্নলিখিত যে-কোনো দুইটি শ্লোক বাংলা অথবা ইংরেজিতে অনুবাদ কর:
[Translate into Bengali or English any two of the following verses:]

(ক) আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ২/৭০

(খ) ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৪/৩৮

৯. মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
[Give a brief introduction of Mahābhārata.]

১০. বৈদিক সাহিত্যের প্রধান চারটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
[Give a short account of the four main branches of the Vedic Literature.]

১১. কালিদাস কে ছিলেন? কালিদাসের রচনাবলীর নাম লিখ।
[Who was Kālidāsa? Write the name of the literary works of Kālidāsa.]

১২. ‘উপনিষদ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? ঈশোপনিষদের শান্তিমন্ত্রটি লিখ।
[What is the derivative meaning of the term ‘Upaniṣada'. Rewrite the Śāntimantra of the Īśopaniṣada.]

১৩. বেদাঙ্গ কি? বেদাঙ্গ কয়টি ও কি কি?
[What is Vedanga? How many Vedangas are there and what are they?]

১৪. নিচের যে কোন দুইটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ:-
[Write short note any two of the following:-]
ক. পুরাণ খ. চতুবর্ণ গ. রামায়ণ ঘ. মেঘদূত

১৫. যে কোন দশটি বাক্য সংস্কৃতে অনুবাদপ কর।
[Translate any ten sentences into Sanskrit.]

ক. রাম ও শ্যাম বনে বাস করে।
খ. কখনও ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করো না।
গ. শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভে সক্ষম হন।
ঘ. রূপহীনদের বিদ্যাই রূপ।
ঙ. বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়।
চ. অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
ছ. অহংকার অজ্ঞানতার ফসল।
জ. জ্ঞানই শক্তি, অজ্ঞানতা দুঃখের মূল।
ঝ. বাংলাদেশে অনেক নদী আছে।
ঞ. ছাত্রদের নিয়মিত শরীরচর্চা করা কর্তব্য।
ট. রাবণ লঙ্কার রাজা ছিলেন।
ঠ. মনোহর ও হিতকর বাক্য দুর্লভ।
ড. আকাশে সূর্য উঠছে।
ঢ. বাংলাদেশে অনেক নদী আছে।

(সব গোপী হৈতে রাধাকৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় 'প্রিয়ার সরসী'।। (ম-২, ১৮প, ৭)
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।। (ম-২, ১৮প, ৮) (পদ্ম পুরাণের শ্লোক)

সব গোপীর মধ্যে রাধারাণী যেমন প্রিয়তমা, তেমনি রাধাকুণ্ডও প্রিয়। কারণ এটি রাধারাণীর নিজস্ব সরোবর বা স্নান করার পুকুর। এই কারণে রাধাকুণ্ড বিশ্বব্রহ্মান্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ-আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥
তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥

অর্থাৎ তুমি আবার বৃন্দাবনে ফিরে চলো। ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।)

Total teaching hours-30 (40-45 periods) Total questions-30 Total marks-150

প্রশ্ন-১। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

অপ্রালব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ।।

উত্তরঃ যিনি জড়-জাগতিক সংসারের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সৎকর্ম পরায়ণ হয়েছেন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তিনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। ভক্তি সহকারে যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বীজত্ব সমস্ত পাপ কর্মের ফলই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত প্রবল পাপ নাশকারী শক্তি আছে।

প্রশ্ন-২। নৃসিংহ পুরাণের এই শ্লোকের তাৎপর্য লিখ।

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোহপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরাভবতাম্ উপৈতি চন্দ্রঃ।।

উত্তরঃ কেউ সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে রত থাকলেও কখনও কখনও তাকে হীন কর্মে নিয়োজিত দেখা যায়; এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে চাঁদের কলঙ্কের মত মনে করতে হবে। এই প্রকার কলঙ্ক চন্দ্রের আলো বিকিরণের বাধাস্বরূপ হয় না। তেমনই সৎ পথ থেকে ভক্তের আকস্মিক পতন তাঁকে পাপাত্মায় পরিণত করে না। তা বলে এটি কখনও মনে করা উচিৎ নয় যে, অপ্রাকৃত ভগবৎ-পরায়ণ ভক্ত সব রকম নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন, শাস্তি পেতে হবে।

প্রশ্ন-৩। বরাহ পুরাণের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দাও।

নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোহভবদ্ দেবঃ স চ সর্বজ্ঞতাং গতঃ।।

উত্তরঃ "নারায়ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান আর তাঁর থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁর থেকে শিবের জন্ম হয়"। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং তাঁকে বলা হয় সব কিছুর নিমিত্ত কারণ। তিনি বলেছেন, "যেহেতু সব কিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমিই সব কিছুর আদি উৎস। সব কিছুই আমার অধীন আমার উপরে কেউ নেই। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া পরম নিয়ন্তা আর কেউ নেই।

প্রশ্ন-৪। আদি পুরাণের এই শ্লোকের তাৎপর্য লিখ।

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্ ।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ।।

উত্তরঃ হে পার্থ! আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীরাই জানে। স্বরূপত অন্য আর কেউ তা জানে না। ত্রিভুবনে এই পৃথিবী বিশেষভাবে ধন্যা, কেননা এই পৃথিবীতে রয়েছে বৃন্দাবন নামক পুরী। আর সেখানে গোপীকারা বিশেষভাবে ধন্যা, কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে আমার শ্রীমতী রাধারাণী। এই শ্লোকটি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

প্রশ্ন-৫। কূর্ম পুরাণের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দাও।

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোহণুশ্চৈব সর্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবান সবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বিশেষ, তিনি বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও অনুসদৃশ এবং তিনি বর্ণহীন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ণ ও আরক্তলোচন। জড় বিচারে এগুলি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, তাহলে তার পক্ষে সেগুলি সব সময় সম্ভব।

প্রশ্ন-৬। শিব পুরাণের শ্লোক এবং পদ্ম পুরাণের শ্লোকের অর্থ লিখ।

দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।।

উত্তরঃ কলিযুগে বেদের কল্পিত অর্থ প্রচার ক'রে জনসাধারণকে আমার প্রতি বিমুখ করো।
শিব পার্বতীকে বললেন, মায়াবাদ দর্শন হচ্ছে অসৎ-শাস্ত্র। তা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। হে পার্বতী! কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণরূপে এই কল্পিত মায়াবাদ দর্শন প্রচার করি।

প্রশ্ন-৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।।

উত্তরঃ কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন--এই পাঁচটি প্রথা নিষিদ্ধ। ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করার যে সন্ন্যাস তা অনুমোদিত এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা, কেননা সেই প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ করার ফলে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের জন্য সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হয়। তবে মায়াবাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিৎ নয়, প্রকৃতপক্ষে যা হচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

প্রশ্ন-৮। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

শঙ্খচক্রাদ্যূর্ধ্বপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্ ।
তন্নামকরণং চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।।

উত্তরঃ দীক্ষার পর দীক্ষিত শিষ্য যে শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত তা নির্দেশ করার জন্য শিষ্যের নাম পরিবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। দীক্ষার পর শিষ্যকে অবশ্য অবশ্যই তার শরীরের দ্বাদশ-অঙ্গে বিশেষ ক'রে ললাটে তিলক (ঊর্ধ্বপুণ্ড্র) ধারণ করতে হয়। এগুলি হচ্ছে যথার্থ বৈষ্ণবের লক্ষণ। দীক্ষার সময় শ্রীগুরুদেব কর্তৃক শিষ্যের নামের পরিবর্তন করা দীক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ।

প্রশ্ন-৯। বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণের এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা দাও।

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকং চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।।
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।।

উত্তরঃ কেউ যদি মহাপ্রসাদকে সাধারণ ভাত-ডাল বলে মনে ক'রে, তাহলে তার মহা অপরাধ হয়। সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে শুচি-অশুচি বিচার থাকে, কিন্তু মহাপ্রসাদে সেই রকম কোনো বিচার নেই। মহাপ্রসাদ চিন্ময় এবং তার কোনো রকম বিকার বা অশুচিতার প্রশ্নই ওঠে না, ঠিক যেমন শ্রীবিষ্ণুর দেহে কোনো রকম বিকার বা অপবিত্রতার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব কোনো ব্রাহ্মণও যদি প্রসাদে শুচি-অশুচি বিচার করে, তাহলে তার কুষ্ঠ রোগ হয় এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজন হারা হয়। এই ধরণের অপরাধে সে নিরয়গামী হয় এবং কখনও আর ফিরে আসে না।

প্রশ্ন-১০। ভবিষ্য পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

ঋক্-যজুঃ-সামাথর্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্ ।
মূল-রামায়ণং চৈব বেদ ইত্যেব শব্দিতাঃ।।
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ।
স্বতঃ প্রামাণ্যং এতেসাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যতে।।

উত্তরঃ ঋক্-বেদ, যজুঃবেদ, সাম-বেদ, অথর্ব-বেদ, ব্রহ্মসংহিতা, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবৎ, চৈতন্যভাগবৎ, চৈতন্যচরিতামৃত, নারদপঞ্চরাত্র এবং মূল রামায়ণ—এই সবকটি বৈদিক শাস্ত্র বলে বিবেচনা করা হয়। ইহা ছাড়াও বৈদিক শাস্ত্রের অনুগত বিভিন্ন নামে খণ্ড খণ্ড গ্রন্থ আছে। মোট ১০৮ খানা উপনিষদের নাম ধরা হয়। জপমালার ১০৮ টি গুটি ১০৮ খানা উপনিষদের প্রতীক। কোনো কোনো বৈষ্ণব পরমার্থবিদ্ মনে করেন যে, জপমালার ১০৮ টি পুঁতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অংশগ্রহণকারী

১০৮ জন গোপীকার প্রতীক। পুরাণসমূহ বিশেষ করে বৈষ্ণবদের জন্য এবং এগুলিও বৈদিক শাস্ত্র। পুরাণে, মহাভারতে এবং রামায়ণে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবকিছু স্বতঃই প্রমাণিত। তার আর অর্থ বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-১১। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে।।

উত্তরঃ ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের প্রতারণা করার জন্য আমি পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার ও নির্গুণ বলে বর্ণনা করি। তেমনই, সমস্ত ভগবৎ-বিদ্বেষী জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য ভগবানের রূপকে অস্বীকার ক'রে, বেদান্তের বিশ্লেষণ ক'রে, আমি এই মায়াবাদ দর্শন রচনা করি।

প্রশ্ন-১২। পদ্মপুরাণের এই শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্ ।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁকগর্হিতম্ ।
কর্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।।
সর্বকর্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।।

উত্তরঃ হে দেবি! মায়াবাদ দর্শনের মাধ্যমে আমি যে কিভাবে অজ্ঞানের অন্ধকার প্রচার করেছি, সেই কথা শ্রবণ কর। কেবল তা শ্রবণ করা মাত্র জ্ঞানীদের পর্যন্ত অধঃপতন হবে। এই দর্শনের মাধ্যমে যা সমস্ত মানুষদের কাছে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক, তা বর্ণনা ক'রে আমি বেদের কদর্থ করেছি এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য সব রকম কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছি। এই মায়াবাদ দর্শনে আমি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক বলে বর্ণনা করেছি। শ্রীরামানুযাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শ্রীমধ্বাচার্যের তত্ত্ববাদ যে কিভাবে মায়াবাদ দর্শনকে প্রবল বিক্রমে পরাজিত করেছে তা বৈদিক দর্শনের পাঠকেরা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

প্রশ্ন-১৩। গরুড় পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবাণাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ।।

উত্তরঃ হাজার হাজার ব্রাহ্মণের মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতাসম্পন্ন হন এবং এই রকম হাজার হাজার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন সর্ববেদান্ত-পারগ হন। এই রকম কোটি কোটি বেদান্তবিদের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন বিষ্ণুভক্ত পাওয়া যায় এবং এই রকম হাজার হাজার বিষ্ণুভক্তের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত দেখা যায়, যারা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। এইভাবে দেখা যায় যে, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তের স্থান সকলের উপরে।

প্রশ্ন-১৪। বৃহৎ-বামন পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

ষষ্ঠিবর্ষ সহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুপলব্ধয়ে।।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ।।

উত্তরঃ ব্রজগোপীকাদের চরণরেণু উপলব্ধি করার জন্য আমি ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলোম, কিন্তু তবুও আমি তাঁদের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নাই। আমার কি কথা--শিব, শেষ এবং লক্ষ্মীদেবীও তাঁদের মহিমা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন নাই। ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী, এমনকি আমার নিজের থেকেও গোপীগণ আমার অধিক প্রিয়। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রেষ্ঠা।

প্রশ্ন-১৫। কূর্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনাং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ।।

উত্তরঃ হে দেবী, সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা। কিন্তু তাঁর থেকেও শ্রেয় 'তদীয়' বা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত যা, তাঁর আরাধনা। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তেমনই তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক, শ্রীগুরুদেব এবং সমস্ত ভক্তরাও 'তদীয়'। ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, গুরু, বৈষ্ণব, তাদের ব্যবহৃত সবকিছুই 'তদীয়' এবং নিঃসন্দেহে সকলেরই আরাধ্য।

প্রশ্ন-১৬। বরাহ পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদিগতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ।।

উত্তরঃ অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গ-গোগের অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে নিজেই অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যান। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তারূপে বর্ণনা করেছেন। শিশুকে যেমন তার বাবা-মা সর্বতোভাবে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনই ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনো রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহান কৃপাবলে তাঁর বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। মাঝ সমুদ্রে পতিত হয়েছে যে মানুষ, সে যতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন, শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তাহলে সে অনায়াসেই রক্ষা পেতে পারে। তেমনই, ভগবানও তাঁর ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ ক'রে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

প্রশ্ন-১৭। বিষ্ণু পুরাণের শ্লোকের অর্থ লিখ।

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।।

উত্তরঃ নয় লক্ষ জলজ। কুড়ি লক্ষ বৃক্ষ-লতা আদি স্থাবর। কৃমি, কীট, সরীসৃপ-আদি এগারো লক্ষ ও দশ লক্ষ পক্ষী। ত্রিশ লক্ষ পশু এবং চার লক্ষ মানুষ। তাদের কিছু এক গ্রহে রয়েছে এবং কিছু অন্য গ্রহে রয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সবকটি গ্রহে, এমনকি সূর্যগ্রহে পর্যন্ত জীব রয়েছে। প্রতিটি গ্রহেই জীব রয়েছে; তা সেই গ্রহ মাটি, জল, আগুন বা আকাশ, যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন। সেখানকার জীবনের এই পৃথিবীর জীবদের মতো একই প্রকারের রূপ না থাকতে পারে, কিন্তু ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি ভিন্ন রূপ তাদের রয়েছে।

প্রশ্ন-১৮। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।

উত্তরঃ মন্দিরে ভগবানের অর্চামূর্তিকে কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরি বলে মনে করা উচিত নয় বা গুরুদেবকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা উচিত নয় এবং ভগবানের চরণামৃত বা গঙ্গাজলকে সাধারণ জল বলে মনে করা উচিত নয়। তেমনই ভগবানের চিন্ময় নাম সমন্বিত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কে সাধারণ জড় শব্দ বলে মনে করা উচিত নয়। জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত প্রকাশ তাঁর সেবায় যুক্ত ভক্তদের প্রতি তাঁর করুণারই প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন তীর্থে ভগবান অর্চামূতিরূপে বিরাজ করেন। অর্চামূতিকে কাঠ অথবা পাথর বলে মনে করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোক দুইটির অর্থ লিখ।

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্ ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ।।

উত্তরঃ মায়িক তত্ত্ব এবং পরব্যোম এই দুয়ের মাঝখানে বিরজা নদী। তা সর্ব মঙ্গলময়, বেদ যার অঙ্গ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের ঘর্ম জনিত জলের দ্বারা প্রবাহিতা। সেই বিরজা নদীর অপর পারে অক্ষয়, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদ-স্বরূপ, ত্রিপাদ বিভূতি সম্পন্ন পরব্যোম নিত্য বর্তমান।

প্রাশ্ন-২০। স্কন্ধ পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।।

উত্তরঃ হে ব্যাধ, তোমার মধ্যে যে অহিংসা আদি গুণাবলীর বিকাশ হয়েছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কেননা যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হন তারা কখনও অন্য জীবকে মাৎসর্যবশে ক্লেশ প্রদান করেন না। ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; তার সঙ্গে জড় কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই। ভক্ত-সঙ্গে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। ভগবদ্ভক্তি যেহেতু সম্পূর্ণ জড়াতীত, তাই কোনো জড় কার্যকলাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন-২১। কূর্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।।

উত্তরঃ কোনো অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং দেহীতে ভেদ নেই। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব; অর্থাৎ, তাঁর দেহ এবং দেহীতে কোনো ভেদ নেই, কেননা তাঁর সত্তা পূর্ণ চিন্ময়। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ দর্শন করে, তৎক্ষনাৎ সে জড়া-প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-২২। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরি-কথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্ট্যং যথা পয়ঃ।।

উত্তরঃ অবৈষ্ণবের মুখ থেকে কখনও হরিকথা পর্যন্ত শ্রবণ করা উচিত নয়। কেননা তা সর্পের উচ্ছিষ্ট দুধের মতো। বহু মায়াবাদীও আজকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং তাদের পাঠ শুনতে বহু লোকের ভীড় হয়। বহু মায়াবাদী আজকাল বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুরু করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে তা নিষেধ করেছেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জীবন এবং আচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত প্রকাশ, তাই তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

প্রশ্ন-২৩। বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয় পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্ ।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ।।

উত্তরঃ জীবন্মুক্তরাও কখনও কখনও সংসার বাসনায় আসক্ত হন, কিন্তু যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা কখনও এই ধরণের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবন্মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেন, তাহলে তিনি পুনরায় জড় বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হন। জীবন্মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করলে, তিনি সংসার বাসনায় অধঃপতিত হন এবং তখন তিনি চিন্ময় তত্ত্বকেই কেবল অদ্বয় জ্ঞান বলে মনে করেন।

প্রশ্ন-২৪। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে।।
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্ ।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ।।

উত্তরঃ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে কখনও শূদ্র বলে মনে করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত ভক্তদের 'ভাগবত' বলে চেনা উচিত। যদি সে ভগবানের ভক্ত না হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে জন্ম হলেও তাকে শূদ্র বলে বিবেচনা করতে হবে। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কেউ যদি অবৈষ্ণব হয়, তাহলে তার মুখ দর্শন করা উচিত নয়, ঠিক যেভাবে কুকুর-ভোজী চণ্ডালের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণোত্তর কুলে জাত বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্র করতে পারেন।

প্রশ্ন-২৫। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ।।
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।।

উত্তরঃ শূদ্র, নিষাদ অথবা চণ্ডাল কুলজাত ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে সেই সেই বর্ণ বলে যে মনে করে, সে অবশ্যই নরকগামী হয়। ব্রাহ্মণকে অবশ্যই বৈষ্ণব এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হতে হবে। তাই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত বলে সম্বোধন করার প্রথা প্রচলিত আছে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। তাই বৈষ্ণব অবশ্যই ব্রাহ্মণ, কিন্তু সব ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব নন। ম্লেচ্ছও যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তাহলে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত বলে স্বীকার করতে হবে।

প্রশ্ন-২৬। বিষ্ণু পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ।।

উত্তরঃ এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীরা প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেই—যদি বেদ ও তন্ত্রের জ্ঞানে বাস্তবিকই পণ্ডিত হন, তাহলে তিনি শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। ভগবানের ভক্তরাই কেবল পূর্ণরূপে জানেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত। জড় জগতে তিনি পাঁচটি জড় উপাদান, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা প্রকাশিত। আরো একটি শক্তির দ্বারা তিনি জড় জগতে প্রকাশিত হন, তা হচ্ছে জীবাত্মা। চিৎ-জগৎ ও জড় জগতে সমস্ত প্রকাশই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তি। চরম

সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবান এক এবং তিনি সব কিছুতেই নিজেকে বিস্তার করেছেন। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই বৈদিক বাণীর মাধ্যমে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি তা জানেন, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় একাগ্রীভূত করেন।

প্রশ্ন-২৭। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

যে কুর্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা চ প্রেরকঃ।।

উত্তরঃ একাদশীর দিন পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করা হলে, সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠাতা এবং যার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে সেই পূর্বপুরুষ, এবং শ্রাদ্ধের পুরোহিত, সকলেই নরকে গমন করে। একাদশী তিথিতে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। যখন মৃত্যুবার্ষিকী একাদশীর দিন পড়ে, তখন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান একাদশীর দিন না করে দ্বাদশীর দিন করা উচিত। মকর সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে) অথবা কর্কট সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু করে), শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে মহালয়া উৎসব উদ্‌যাপন করা হয় এবং এই দিনটিকে বৈদিক চন্দ্র বৎসরের শেষ দিন হিসাবে ধরা হয়।

প্রশ্ন-২৮। পদ্ম পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।।

উত্তরঃ যোগীরা পরমতত্ত্বে রমণ করে অনন্ত চিদানন্দ আস্বাদন করেন। তাই, সেই পরমব্রহ্মকে রাম বলা হয়। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিষ্ঠাহারী শূকরেরা এই সুখ লাভ করে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি অনিত্য, কারণ দেহটিই অনিত্য। জীবন্মুক্ত পুরুষ কখনও অনিত্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন না। অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ পাবার পরে, কিভাবে তিনি অনিত্য জড় সুখ ভোগের প্রতি প্রয়াসী হতে পারেন? এই ধরনের সুখভোগ আদি ও অন্ত বিশিষ্ট।

প্রশ্ন-২৯। বিষ্ণু পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

উত্তরঃ হে ভগবান! তুমি গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তুমি সমগ্র মানব-সমাজ ও সমগ্র জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী। এই প্রার্থনায় গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতীক এবং গাভী হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান খাদ্যের প্রতীক। গাভী ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার প্রাণীদের সব রকম প্রতিরক্ষা বিধান করা উচিত। সেটাই হচ্ছে সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। আধুনিক মানব-সমাজে পারমার্থিক জ্ঞানকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং গোহত্যার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সব রকম পশু হত্যার মধ্যে গোহত্যা হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম কার্য, কারণ দুধ দান ক'রে গরু আমাদের সবরকমের আনন্দ দান করে। গোহত্যা হচ্ছে সবরকমের পাপ কর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ। গরুর দুধের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রীতি লাভ করার পরেও যে মানুষ গোহত্যা করতে চায়, সে অত্যন্ত গভীরভাবে তমসাচ্ছন্ন।

প্রশ্ন-৩০। স্কন্দ পুরাণের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।

উত্তরঃ যথেষ্ঠ পূণ্যবান না হলে মহাপ্রসাদ, ভগবান, ভগবানের দিব্যনাম এবং বৈষ্ণবদের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। ভগবানের প্রসাদ, ভগবানের নাম এবং ভগবানের শুদ্ধভক্ত চিন্ময় বস্তু। যাঁরা স্বল্প পুণ্যবান, তাঁদের মহাপ্রসাদে, পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দে, ভগবানের দিব্য নামে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। প্রসাদকে কখনও সাধারণ খাবার বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ তাঁর মুখের অমৃত মিশ্রিত। এই প্রসাদে এত স্বাদ কোথা থেকে এল? নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত এতে সঞ্চারিত হয়েছে। সেই প্রসাদ যেন কোটি কোটি অমৃতের থেকেও সুস্বাদু।

[ভগবান নির্বিশেষ না সবিশেষ এ সম্বন্ধে বহু-আলোচিত মতভেদ দেখা যায়। উপনিষদে নির্বিশেষ তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতির বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও পরতত্ত্ব যে চরমে নির্বিশেষ তা কোথাও ঘোষণা করা হয় নাই। নির্বিশেষ মতবাদ হচ্ছে ভ্রান্ত মতবাদ। অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে পরতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ, তাঁর কোনো আকার নেই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন—

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্ত-সম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।
(শঙ্কর-ভাষ্য-ভ.গী.)

এই ব্রহ্মাণ্ড একটি জড় সৃষ্টি, কিন্তু নারায়ণ এই প্রকার ভৌতিক সৃষ্টির অতীত।

পরাৎপরতত্ত্ব নারায়ণ অব্যক্তের (মায়ার) পরপারে অবস্থিত আছেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড বা তদন্তর্গত সমস্ত বৈশিষ্ট অব্যক্ত (মায়া) হইতেই সম্ভূত হইয়াছে। অনন্তকোটি ভূমণ্ডল এই এক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই অবস্থিত এবং সপ্তদ্বীপ মেদিনীও তাহার মধ্যে একটি। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যিনি মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করেছিলেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করা। তিনি স্বীকার ক'রে গেছেন, তিনি যে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যারূপে পুষ্পিতা বাণী প্রচার ক'রে গেছেন, তা মৃত্যুর সময় জীবকে রক্ষা করতে পারবে না, পারবে না। তাই তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
সম্প্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে ন হি ন হি রক্ষতি দুকৃঞ করণে।।
(বৈরাগ্য বিদ্যা—শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ) (পৃ.২২৬)

হে মূর্খের দল! তোমরা গোবিন্দের ভজনা করো, গোবিন্দের ভজনা করো, গোবিন্দের ভজনা করো। তোমাদের ব্যাকরণ-জ্ঞান আর বাক্য-বিন্যাস মৃত্যুর সময়ে তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না, পারবে না।]

Total teaching hours-40 (50-60 periods)　　Total questions-30　　Total marks-150

প্রশ্ন-১। ব্রহ্মসংহিতা (৫/১) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারনম্ ।।

উত্তরঃ ভগবানের গুণাবলী ধারণকারী বহু পুরুষ আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, কারণ তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন অনাদির আদি পুরুষ গোবিন্দ এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ। ব্রহ্মা নিজে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ, অথবা গোবিন্দ নামে পরিজ্ঞাত ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। ভাগবতেও পরমেশ্বর ভগবানের অনেক অবতারের বর্ণনা আছে, কিন্তু সেখানেও বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম এবং তাঁর থেকে বহু বহু অবতার ও ঈশ্বর বিস্তার লাভ করে।

প্রশ্ন-২। মুণ্ডক উপনিষদে প্রদত্ত তিনটি শ্লোকের (২/২/১০-১১-১২) ব্যাখ্যা লিখ।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।।
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্মা
পশ্চদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈ-
বেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ।।

উত্তরঃ উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই পরম পুরুষের অঙ্গপ্রভা। পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গপ্রভা বা দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। জড় আবরণের উর্ধ্বে চিৎ-জগতে অন্তহীন ব্রহ্মজ্যোতি রয়েছে, যা সবরকমের কলুষ থেকে মুক্ত। সেই জ্যোতির্ময় শুভ্র আলোককে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি বলে জানেন। সেই চিন্ময় লোককে উদ্ভাসিত করার জন্য সূর্যরশ্মি, চন্দ্র কিরণ, অগ্নি অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিকই জড় জগতের যে আলোক দেখা যায়, তা সেই পরম জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই ব্রহ্ম সম্মুখে ও পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে এবং উপরে ও নিচে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, সেই ব্রহ্মজ্যোতি জড় ও চেতন আকাশের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।

প্রশ্ন-৩। ঋকবেদের (১/১৫৪/৬) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা আয়াসঃ।

অত্রাহ তদুরুগায়স্য কৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।।

উত্তরঃ আমরা আপনাদের (শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের) সুন্দর গৃহে যেতে চাই, যার চারপাশে অপূর্ব সুন্দর এবং অতি বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত গাভীরা গোচারণ করে। হে উরুগায় কৃষ্ণ, (যিনি প্রচুরভাবে বন্দিত হন), পরম আনন্দ বর্ষণকারী আপনার সেই পরম ধাম এই পৃথিবীতে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আপনার পরম ধামসহ আপনি পৃথিবীর এই স্থানে অবতীর্ণ হয়েছেন। গোলক বৃন্দাবন ধাম বৈকুণ্ঠেরও উপরে অবস্থিত। মনুষ্য লোকের উর্দ্ধভাগে পক্ষীদের গতি। আকাশের উপর স্বর্গের দ্বার, সূর্য এবং স্বর্গের উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক। দেবীধামের উপরে উমার সঙ্গে শিব বর্তমান। বৈকুণ্ঠের উপরে গোলক, তা শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখও গোপীগণ এবং নন্দ-যশোদা আদি সাধ্যগণ পালন করেন। সেই গোলক অত্যন্ত দুরারোহ। (ভাগবতম প্রশ্ন-২৯ মনোযোগ সহকারে অনুসরণ কর।)

প্রশ্ন-৪। ব্রহ্মসংহিতা (৫/৫২) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

যচ্চক্ষুষে সবিতা সকলগ্রহাণাং রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

উত্তরঃ সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। সূর্য হচ্ছেন গ্রহগুলির রাজা এবং বর্তমানে সূর্যদেব বিবস্বান সূর্যগ্রহকে পরিচালনা করছেন। এই সূর্যগ্রহ সমস্ত গ্রহগুলিকে তাপ ও আলোক দান ক'রে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করছেন। এই সূর্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ ক'রে ভগদ্গীতার জ্ঞান দান করেন। এই মহাকালকল্পে সূর্যদেবের নাম বিবস্বান, তিনিই হচ্ছেন সূর্যলোকের অধিশ্বর। এই সূর্য থেকেই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন-৫। ব্রহ্মসংহিতা (৫/৩৩) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।

বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

উত্তরঃ আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত ও অনাদি। যদিও অনন্ত রূপে পরিব্যাপ্ত, তবুও তিনি সকলের আদি, পুরাণ-পুরুষ এবং তিনি সর্বদাই নবযৌবন সম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। যাঁরা শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, তাঁদের কাছেও ভগবানের সচ্চিদানন্দময় এই রূপ দুর্লভ, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানকে এই রূপে দর্শন করেন। আমরা ভগবানের নানাবিধ অবতারের সম্বন্ধে জানতে পারি। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব আদি বহুরূপে অবতরণ করেন, কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর আদি স্বরূপ এবং তিনি স্বয়ং অবতরণও করেন।

প্রশ্ন-৬। নারদ পঞ্চরাত্রের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।

তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ।।

উত্তরঃ যিনি একাগ্র চিত্তে স্থান-কালের অতীত শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপক শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করেন, তিনি কৃষ্ণভাবনায় তন্ময় হন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্য লাভ ক'রে চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হওয়াটাই যোগ সাধনার পরম সিদ্ধি। সমাধিযুক্ত যোগী যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করছেন, তখনই তিনি সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন-৭। স্মৃতিশাস্ত্রের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বব্যাপী ন সংশয়ঃ।

ঐশ্বর্যাদ্রূপমেকং চ সূর্যবৎ বহুধেয়তে।।

উত্তরঃ অদ্বিতীয় হলেও শ্রীবিষ্ণু নিঃসন্দেহে সর্বব্যাপক। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এক বিগ্রহরূপে তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান। সূর্যের মতো তিনিও একই সময় বহু স্থানে দৃষ্ট হন। যদিও ভগবান একজন, তিনি বহুরূপে অসংখ্য হৃদয়ে বিরাজমান।

প্রশ্ন-৮। বৃহদ্‌বিষ্ণুস্মৃতির এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।

স সর্বস্মাদ্‌ বহিষ্কার্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ।।

মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানামাচরেৎ।

উত্তরঃ যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত দেহ বলে মনে করে, তাকে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের সমস্ত বিধান থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত এবং ঘটনাক্রমে যদি কখনও তার মুখদর্শন ঘটে, তা হলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্নান করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তারাই উপহাস করে, যারা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের নিয়তি হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিশ্চিতভাবে বারবার আসুরিক ও নিরীশ্বরবাদী যোনিতে জন্মগ্রহণ করা। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে

একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা মহা অপরাধ। যারা তা করে তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত, কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বতরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

প্রশ্ন-৯। বৈদিক শাস্ত্রের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।।

উত্তরঃ এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং এই দেহের মধ্যেই বাস করেন দেহের মালিক। পরমেশ্বর ভগবান এই দেহ ও দেহের মালিক উভয়কেই জানেন। তাই, তাঁকে সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। এভাবেই কর্মক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। দেহ গঠিত হয় ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, যার অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা'। রাজা যেমন রাজ্যের সমস্ত কার্যকলাপের মুখ্য নিয়ন্তা এবং তাঁর প্রজারা হচ্ছে গৌণ নিয়ন্তা, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান নিয়ন্তা। ভগবান বলেছেন, "আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ"। এর অর্থ হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ; জীবাত্মা কেবল তার নিজের শরীরটির ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের মুখ্য মালিক।

প্রশ্ন-১০। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫/৯) শ্লোকটির ব্যাখা লিখ।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।

উত্তরঃ কেশাগ্রকে শতভাগে ভাগ ক'রে তাকে আবার শতভাগে ভাগ করলে তার যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি। অসংখ্য যে চিৎকণা রয়েছে, তার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবাত্মা হচ্ছে এক-একটি চিৎকণা, যার আয়তন পরমাণুর থেকেও অনেক ছোট এবং এই জীবাত্মা বা চিৎকণা সংখ্যাতীত। এই আত্মার আয়তন কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১১। অমৃতবিন্দু উপনিষদ-২ তে লিখিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ।।

উত্তরঃ মনই মানুষের বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি মনের তন্ময়তা হচ্ছে বন্ধনের কারণ এবং বিষয়ের প্রতি মনের অনাসক্তি হচ্ছে মুক্তির কারণ। সুতরাং কৃষ্ণভাবনায় সর্বদা মনকে নিয়োজিত রাখলে চরম মুক্তি লাভ হয়। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বশ ক'রে ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে তাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখা। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, মনকে এমনভাবে সংযত করতে হবে যাতে তিনি বদ্ধ জীবকে অজ্ঞান-সাগর থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। জড় বন্ধনে আবদ্ধ জীব মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে।

প্রশ্ন-১২। মুণ্ডক উপনিষদ (৩/১/২) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪/৭) শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।

উত্তরঃ দুটি পাখি একই গাছে বসে আছে, কিন্তু যে পাখিটি ফল আহারে রত সে গাছের ফলের ভোক্তারূপে সর্বদাই শোক, আশঙ্কা ও উদ্বেগের দ্বারা মুহ্যমান। কিন্তু যদি সে নিত্যকালের বন্ধু অপর পাখিটির দিকে ফিরে তাকায়, তবে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত শোকের অবসান হয়, কারণ তার বন্ধু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সমগ্র ঐশ্বর্যের দ্বারা মহিমান্বিত। একটি পাখি (জীবাত্মা) সেই গাছের ফল খাচ্ছে, অন্য পাখিটি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁর বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ ক'রে চলেছেন। জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে তার এই সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই এক গাছ থেকে আর এক গাছে অর্থাৎ এক দেহ থেকে আর এক দেহে সে ঘুরে বেড়ায়। এই জড় দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে অন্য পাখিটিকে পরম গুরুরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ অধীন পাখিটি সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হয়।

প্রশ্ন-১৩। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/৭-৮) শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম।।

উত্তরঃ ভগবান হচ্ছেন ঈশ্বরদেরও পরম ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও পরম দেবতা। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দান করেন; তারা কেউই পরমেশ্বর নয়। তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজ্য এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পতিদের পরম পতি। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত অধিপতি ও নিয়ন্তার অতীত, সকলের পূজ্য। তাঁর থেকে বড় আর কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। তাঁর দেহ সাধারণ জীবের মতো নয়। তাঁর দেহ এবং তাঁর আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই যে-কোনো ইন্দ্রিয়ের কর্ম সাধন করতে পারে। তাই তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর শক্তি অসীম ও বহুমুখী, তাই তাঁর সমস্ত কর্ম স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/৮) শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার ফলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এছাড়া আর কোনোই পথ নেই। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না, সে তমগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার পক্ষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মধুর বোতল চাটলেই যেমন মধুর স্বাদ লাভ করা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে ভগবদ্গীতা পাঠ করলে এবং তার মন গড়া ব্যাখ্যা করলেও তেমন কোনো কাজ হয় না। এই সমস্ত দার্শনিকেরা জড় জগতের অনেক সম্মান, অনেক প্রতিপত্তি, অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে কিন্তু তারা ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে মুক্তি লাভের যোগ্য নয়। যিনি ভগবানকে বলতে পারেন, তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান—তাঁর তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের নিত্য ধামে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানের চিন্ময় সাহচর্য লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানের এই রকম একনিষ্ঠ ভক্তই পরমার্থ লাভ করেন।

প্রশ্ন-১৫। কঠ উপনিষদে (১/৩/৩) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।

উত্তরঃ এই দেহরূপ রথের আরোহী হচ্ছে জীবাত্মা, বুদ্ধি হচ্ছে সেই রথের সারথি। মন হচ্ছে তার বল্গা এবং ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে ঘোড়া। এভাবেই মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহচর্যে আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। চিন্তাশীল মনীষীরা এভাবেই চিন্তা করেন। বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরিচালিত করা উচিত, কিন্তু মন এতো শক্তিশালী ও দুর্দমনীয় যে, বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে সে বুদ্ধিকেই পরাভূত ক'রে তাকে পরিচালিত করতে শুরু করে। ঠিক যেমন, অনেক সময় জটিল সংক্রমণ ওষুধের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। এই রকম শক্তিশালী যে মন, তাকে যোগ-সাধনার মাধ্যমে সংযত করার বিধান দেওয়া হয়েছে। বেগবতী বায়ুকে দমন করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং তার তুলনায় অস্থির মনকে বশ করা আরো কঠিন। মন দমন করার সবচেয়ে সহজ পন্থা প্রদর্শন ক'রে গেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সেই পন্থা হচ্ছে পূর্ণ দৈন্য সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।

প্রশ্ন-১৬। কঠ উপনিষদে (১/৩/৪) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।

উত্তরঃ মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভুত করার থেকেও অধিকতর কঠিন। সাংসারিক মানুয়েরা প্রতিনিয়ত নানা রকম বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, তাই তার পক্ষে মনকে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। কৃত্রিম উপায়ে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়ে মনের ভারসাম্য সৃষ্টি করার অভিনয় করলেও, বাস্তবিকভাবে কোনো সংসারী মানুষ তা করতে পারে না। কারণ, তা প্রচণ্ড বেগবতী বায়ুকে সংযত করার চাইতেও কঠিন। মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। তাহলেই আর কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন উদ্বিগ্ন হবে না।

প্রশ্ন-১৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/৯) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ।।

উত্তরঃ আমি সেই পরমেশ্বরকে জানি, যিনি সর্বতোভাবে সংসারের সকল অজ্ঞানতার অন্ধকারের অতীত। যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই কেবন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারেন। এই পরম পুরুষের জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়েই মুক্তি লাভ করা যায় না। এই পরম পুরুষের জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো সত্য নেই, কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর এবং তিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর। একটি গাছের মতো মৌনভাবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং তিনি সমস্ত পরব্যোমকে আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছেন। একটি গাছ যেমন তার শিকড় বিস্তার করে, তিনিও তেমনই তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে বিস্তৃত করেছেন। এই সমস্ত শ্লোক থেকে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছে পরম তত্ত্ব, যিনি তাঁর জড় ও চিন্ময় অনন্ত শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত।

প্রশ্ন-১৮। ঈশোপনিষদের (মন্ত্র ১৫) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।

তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

উত্তরঃ হে ভগবান! তুমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। তোমাকে ভক্তি করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তুমি আমাকেও পালন করো। তোমার অপ্রাকৃত রূপ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। ব্রহ্মজ্যোতিই তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির আবরণ। কৃপা ক'রে তুমি তোমার এই জ্যোর্তিময় আবরণকে উন্মোচিত ক'রে তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন দান কর। ভগবানের

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁর চিন্ময়-শক্তি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই কারণেই অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিশেষবাদীরা ভগবানকে দেখতে পায় না। আপনি সর্বদাই আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার করছেন, তাই কেউই আপনাকে বুঝতে পারে না। ভগবান যোগমায়ার যবনিকার দ্বারা নিজেকে আবৃত ক'রে রাখেন, তাই সাধারণ মানুষ তাকে জানতে পারে না। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদের কাছে সমস্ত আনন্দের উৎসরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন-১৯। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/৮) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জহানবলক্রিয়া চ।।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় ও দেহ একজন সাধারণ মানুষেরই মতো, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়, দেহ, মন এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়নি, তারা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, হৃদয়, মন ও সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব; তাই তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি পরম শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদিও তাঁর ইন্দ্রিয় আমাদের মতো নয়, তবুও তাঁর প্রতিটি অঙ্গই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে। তাই, তাঁর ইন্দ্রিয় অপূর্ণ অথবা সীমিত নয়। কেউই তাঁর থেকে মহত্তর হতে পারে না। কেউই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তাই, সকলেই তাঁর থেকে নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। কারণ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতে এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের চেয়ে শ্রেয়। সবাই ভগবানের অধস্তন। কেউই ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না।

প্রশ্ন-২০। গোপালতাপনী উপনিষদে (১/১) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে।।

উত্তরঃ আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ, ও আনন্দময়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, কারণ তাঁকে জানার অর্থ সমগ্র বেদকে জানা এবং সেই কারণেই তিনি হচ্ছেন পরম গুরু। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনিই আরাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ এক, কিন্তু তিনি অনন্তরূপ ও অবতারের মাধ্যমে প্রকাশিত হন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সবিশেষ রূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম আরাধ্য। তিনি হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত রূপের উৎস, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের রূপের উৎস এবং তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ।

প্রশ্ন-২১। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/১২/৩) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং
সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।

উত্তরঃ দেহ থেকে বেরিয়ে এসে পরমাত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করেন। তখন তিনি তাঁর চিন্ময়স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরম ঈশ্বরকে বলা হয় পরম পুরুষ। অর্থাৎ, পরম পুরুষ তাঁর চিন্ময় জ্যোতি প্রদর্শন ও বিকিরণ করেন, যা হচ্ছে পরম জ্যোতি। সেই পরম পুরুষোত্তমই পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। সত্যবতী ও পরাশরের সন্তান ব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পরমাত্মারূপী প্রাদেশিক প্রকাশরূপে বেদেও বর্ণিত হয়েছেন।

প্রশ্ন-২২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৮) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নবদ্বারে পুর দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবান যিনি জীবাত্মার দেহে বাস করছেন, তিনিই হচ্ছেন বিশ্বচরাচরের অধীশ্বর। দেহের নয়টি দ্বার হচ্ছে--দুটি চোখ, দুটি নাক, দুটি কান, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। বদ্ধ অবস্থায় জীব তার দেহকে তার স্বরূপ বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু যখন সে তার অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় খুঁজে পায়, তখন দেহে থাকলেও সে পরমাত্মার মতোই মুক্ত হয়। দেহধারী জীবাত্মা নয়টি দ্বার বিশিষ্ট একটি নগরে বাস করে। দেহরূপী নগরটির কার্য প্রকৃতির বিশেষ গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই সাধিত হয়। জীবাত্মা যদিও স্বেচ্ছায় এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবুও যদি সে ইচ্ছা করে, তবে এর থেকে মুক্ত হতে পারে। জীব যখন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়, তখন তাঁর দেহগত সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়। এই ধরণের নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন ক'রে যখন তার মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়, তখন সে মহানন্দে এই নবদ্বার-বিশিষ্ট নগরীতে বাস করে।

প্রশ্ন-২৩। নারায়ণ সংহিতার শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।

উত্তরঃ দ্বাপর যুগে মানুষের নারদ-পঞ্চরাত্র ও অন্য সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা উচিত। কিন্তু কলিযুগে মানুষের কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা উচিত। বিভিন্ন উপনিষদে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কলিসন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে।।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেও কুলিযুগে কলুষকে নাশ করার জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের থেকে অধিক উপযোগী আর কোনো পন্থা পাওয়া যায়নি। কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান পীতবর্ণ ধারণ ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই কলিযুগে প্রত্যেকের আচরণীয় ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে ভগবানের নাম-সংকীর্তন। এটি প্রবর্তন করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের শুরু হয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে।

প্রশ্ন-২৪। ঈশোপনিষদের মঙ্গলাচরণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫/১) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং যেহেতু তিনি সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ, তাই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে প্রকাশিত সবকিছুই পূর্ণরূপে নিখুঁতভাবে সজ্জিত। পূর্ণ থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিও পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই যদিও তাঁর থেকে বহু পূর্ণ সত্তার প্রকাশ ঘটে, তবুও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন। এই জগতে যদি মূল বস্তু থেকে একটি অংশ নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে মূল বস্তুটি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কখনোই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ-জগতে এক এর সঙ্গে এক যোগ করলে একই থাকে এবং এক থেকে এক বিয়োগ করলেও এক থাকে। তাই জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের অংশাতি-অংশেরও অনুমান করা উচিত নয়। চিৎ-জগতে জড় শক্তি অথবা জড় হিসাব-নিকাশের কোনো প্রভেদ নেই।

প্রশ্ন-২৫। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩/১) মন্ত্রটির ব্যাখ্যা লিখ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

উত্তরঃ এই মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সমস্ত জগৎ পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় ক'রেই বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর তাঁরই শরীরে লীন হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে জীব চিন্ময় এবং সে যখন চিৎ-জগতে প্রবেশ করে বা পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে প্রবেশ করে, তখনও স্বাতন্ত্র আত্মারূপে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—একটি সবুজ পাখি যখন একটি সবুজ গাছে গিয়ে বসে, তখন সে গাছ হয়ে যায় না, যদিও মনে হয় যে সে গাছের সবুজে লীন হয়ে গেছে, তবুও একটি পক্ষীরূপে তার অস্তিত্ব বজায় ধাকে। এই রকমই আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি পশু যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যদিও মনে হয় যে সেই পশুটি বনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, তবুও তার স্বাতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তেমনই জড় জগতে মায়া শক্তি ও তটস্থা শক্তি জীব তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখে।

প্রশ্ন-২৬। শ্বেতাশ্বতর উপরিষদে (৬/২৩) মন্ত্রটির ব্যাখ্যা লিখ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

উত্তরঃ এই শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ঐকান্তিকভাবে শ্রদ্ধা পরায়ণ হন এবং গুরুদেবের প্রতিও যদি তেমন ভাবেই ভক্তি পরায়ণ হন, তবে তিনি সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সেই ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশিত হয়। সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি (বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ) । যিনি সদ্‌গুরু এবং পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পিত, তাঁর কাছেই বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশিত হয়, অন্য কারোর কাছে নয়। কেউ যখন নাস্তিক ভাব অবলম্বন ক'রে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়, তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত হলেও জ্ঞানের সারমর্ম তার কাছে প্রকাশিত হয় না, ভগবানের মায়ার প্রভাবে তার জ্ঞান অপহৃত হয়।

প্রশ্ন-২৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ।।

উত্তরঃ পরমেশ্বর ভগবান যদিও হস্তপদহীন, তথাপি যজ্ঞে নিবেদিত সমস্ত বস্তুই তিনি গ্রহণ করেন। যদিও তিনি চক্ষুহীন, তথাপি তিনি সবকিছু দর্শন করেন। যদিও তিনি কর্ণহীন তথাপি তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন। তাঁকে হস্তপদহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে বলে তাঁকে নিরাকার বা নির্বিশেষ মনে করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের মতো তাঁর জড় হাত পা নেই।

চক্ষুহীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবকিছু দর্শন করেন। অর্থাৎ আমাদের মতো জড় চক্ষু বিশিষ্ট তিনি নন। তাঁর এমনই চক্ষু রয়েছে, যার দ্বারা জগতের সর্ব স্থানের, সর্ব জীবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারা যায়। বৈদিক-শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের যে নির্বিশেষ বর্ণনা, তা কেবল তাঁর জড়াতীত চিন্ময়ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য। পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার বা নির্বিশেষ বলে প্রতিপন্ন করা বেদের উদ্দেশ্য নয়।

প্রশ্ন-২৮। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

উত্তরঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রে পরমতত্ত্বকে প্রথমে 'নির্বিশেষ' বলে বর্ণনা করে সেই সেই বৈদিক মন্ত্র অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকে প্রতিপাদন করে। 'নির্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের দুটি গুণই নিত্য। কেউ যখন এই দুটি রূপেই পরমেশ্বর ভগবানকে বিবেচনা করেন, তখন তিনি যথাযথভাবে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষত্ব প্রবল, কেননা জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্বিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

প্রশ্ন-২৯। কঠোপনিষদে (২/৩/৯) শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্লিপ্তো য এতদবিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।

উত্তরঃ চিন্ময় বস্তু জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। জড় চক্ষুর দ্বারা তাঁকে বর্ণনা করা যায় না, জড় মনের দ্বারা তাকে অনুভব করা যায় না, জড় কলুষিত হৃদয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি কফ-পিত্ত-বায়ু বিশিষ্ট শরীরে আত্মবুদ্ধি স্ত্রী-পরিবার আদিতে মমত্বুবুদ্ধি, জন্মভূমিকে পূজ্যবুদ্ধি করে, তীর্থে স্নান করতে যায়, অথচ চিন্ময় জ্ঞান সম্পন্ন ভগবৎ ভক্তের সঙ্গ করে না, সে গাধার মতো অতিশয় নির্বোধ। নির্বোধ মানুষেরা চিন্ময় বস্তু দর্শন করতে পারে না, কেননা তাদের চিন্ময় বস্তুর দর্শন করার চক্ষু নেই অথবা মনোবৃত্তি নেই। তাই তারা মনে করে আত্মা বলে কিছু নেই। কিন্তু বেদের অনুগামী বুদ্ধিমান মানুষেরা বেদ থেকে তাদের তথ্য সংগ্রহ করেন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়। সমস্ত বেদ এবং পুরাণে নিরন্তর এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন-৩০। নারদ পঞ্চরাত্রের এই শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা লিখ।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

উত্তরঃ যদি শ্রীহরির আরাধনা করা হয়, তা হলে কঠোর তপস্যার কী প্রয়োজন? কেন না তপস্যার লক্ষ্যবস্তু তো লাভ হয়েই গেছে। আর সমস্ত রকমের তপস্যা করেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা না যায়, তা হলে তপস্যার কোনোও মূল্য নেই; কেননা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া সকল তপস্যাই বৃথা শ্রম মাত্র। শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, তিনি যে অন্তরে ও বাইরে সর্বত্রই আছেন, এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তপস্যার তাঁর কী প্রয়োজন? আর শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, এই উপলব্ধিই যদি না হল, তা হলে সব তপস্যাই বৃথা। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তর্পণে রত, জীবনের শেষে তার ভোগসুখবাদী পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া খণ্ডন করার জন্য কঠোর তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন, তাঁর জন্য এই ধরনের প্রচণ্ড তপস্যার প্রয়োজন নেই।

(আত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতি ক্ষুদ্র অংশ ও চিন্ময়। ইহার জন্ম হয় না এবং মৃত্যুও হয় না। ইহা চিরন্তন ও শাশ্বত যাহা সনাতন নামেও অভিহিত হয়। সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থানকারী আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এ কারণে সকল জীবের ধর্মকে আত্মার ধর্ম বা সনাতন ধর্ম বলা হয়। সনাতন ধর্ম কখনো ভাগা-ভাগি হয়ে অংশীদারিত্ব প্রাপ্ত হয় না, নূতন কোনো ধর্মও সৃষ্টি হয় না। সুতরাং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীবের জন্য ধর্ম একটাই এবং তা হচ্ছে সনাতন ধর্ম।)

Total teaching hours-20 (25-30 periods) Total questions-30 Total marks-100

প্রশ্ন-১। হস্তিনাপুরের (বর্তমান দিল্লী শহর) নিকট কুরুক্ষেত্রকে গীতায় ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে কেন ব্যাখ্যা দাও।

উত্তরঃ গীতা হচ্ছে পরম তত্ত্বদর্শন। এই মহৎ তত্ত্বদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, যা সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই পবিত্র তীর্থস্থানরূপে খ্যাত। ভগবান যখন মানুষের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন এই পবিত্র তীর্থ স্থানে তিনি নিজে পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই জ্ঞান দান করেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। কুরুক্ষেত্র হচ্ছে অতি পবিত্র স্থান, যা দেবতারাও পূজা ক'রে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র খুব ভালভাবেই জানতেন যে, অর্জুন এবং পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রদের উপর এই পবিত্র স্থানের মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত হবে, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ধানক্ষেতে যেমন আগাছাগুলি তুলে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে ধর্মের প্রবর্তক ভগবান স্বয়ং উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রদের সমূলে উৎপাটিত ক'রে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেছেন। বৈদিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও সমগ্র গীতার তত্ত্বদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মক্ষেত্রে ও কুরুক্ষেত্রে--এই শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য বোঝা যায়।

প্রশ্ন-২। গীতার এই দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। (১/৩৬)
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। (১/৪৪)

উত্তরঃ এই ধরনের আততায়ীদের বধ করলে মহাপাপ আমাদের আচ্ছন্ন করবে। সুতরাং বন্ধুবান্ধবসহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহার করা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উচিত হবে না। হে মাধব, লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা ক'রে আমাদের কি লাভ হবে? আর তা থেকে আমরা কেমন ক'রে সুখী হব।

হায়! কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা রাজ্য সুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি।

বেদের অনুশাসন অনুযায়ী শত্রু ছয় প্রকার--(১) যে বিষ প্রয়োগ করে, (২) যে ঘরে আগুন লাগায়, (৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, (৪) যে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে, (৫) যে অন্যের জমি দখল করে এবং (৬) যে বিবাহিতা স্ত্রীকে হরণ করে। এই ধরনের আততায়ীদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এদের হত্যা করলে কোনো রকম পাপ হয় না।

প্রশ্ন-৩। গীতার এই দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। (১/৪৫)
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।। (১/৪৬)

উত্তরঃ প্রতিরোধ রহিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যুদ্ধে বধ করে, তাহলে আমার অধিকতর মঙ্গলই হবে।

রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন তাঁর ধনুর্বাণ ত্যাগ ক'রে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করলেন।

ক্ষত্রিয় রণনীতি অনুসারে নিয়ম আছে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় অথবা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাকে আক্রমণ করা যাবে না। কিন্তু অর্জুন স্থির করলেন যে, এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় তাঁর শত্রুরা যদি তাঁকে আক্রমণও করে, তবুও তিনি যুদ্ধ করবেন না। শত্রুসৈন্যকে নিরীক্ষণ করতে অর্জুন রথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি শোকে এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে, তার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ ফেলে দিয়ে, তিনি রথের উপর বসে পড়লেন।

প্রশ্ন-৪। গীতার এই দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।। (২/৯)

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। (২/১১)

উত্তরঃ এভাবে মনোভাব ব্যক্ত ক'রে গুড়াকেশ অর্জুন তখন হৃষীকেশকে বললেন, হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না, এই বলে তিনি মৌন হলেন। পরমেশ্বর ভগবান বললেন--তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত করোর জন্যই শোক করেন না। তুমি প্রাজ্ঞের মত কথা বলছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তোমার নেই। যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন দেহ কি ও আত্মা কি, তাই তিনি জীবিত অথবা মৃত কোনো অবস্থাতেই দেহের জন্য শোক করেন না।

প্রশ্ন-৫। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। (২/২০)

উত্তরঃ আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। গুণগতভাবে পরমাত্মা ও তাঁর পরমাণু সদৃশ অংশ জীবাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যেহেতু সে জড় দেহ ধারণ করে, তাই সেই দেহটির জন্ম হয়। যার জন্ম হয় তার মৃত্যু অবধারিত। তার অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, অর্থাৎ কবে যে তার উদ্ভব হয়েছিল তার কোনো ইতিহাস নেই। আমরা দেহ-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত, তাই আমরা আত্মার জন্ম-ইতিহাস খুঁজে থাকি। কিন্তু যা নিত্য, শাশ্বত, তার কোনো শুরু থাকতে পারে না।

প্রশ্ন-৬। গীতার এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। (২/২৩)

উত্তরঃ আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পুড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানো যায় না। তরবারি, আগ্নেয় অস্ত্র, পর্জন্যাস্ত্র, বায়বীয় অস্ত্র আদি কোনো রকমের অস্ত্রশস্ত্রই আত্মাকে হত্যা করতে পারে না। এই শ্লোকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে আধুনিক যুগের মত আগ্নেয়াস্ত্র তো ছিলই, আর তাছাড়া, জল, বায়ু, আকাশ আদির তৈরি অস্ত্রের ব্যবহারও ছিল। আধুনিক যুগের পারমানবিক অস্ত্রগুলি এক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র। অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ আদির এত সমস্ত অস্ত্র থাকলেও কোনো বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের দ্বারাই আত্মাকে হত্যা করা যায় না।

প্রশ্ন-৭। গীতার এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।। (২/২৪)

উত্তরঃ এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তিনি চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপ্ত অপরিবর্তনীয়, অচল ও সনাতন। পারমানবিক আত্মার এই সমস্ত গুণাবলী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সে অবশ্যই পরমাত্মার পরমাণুসদৃশ অংশ এবং সে নিত্যকাল অপরিবর্তিতভাবে একই পরমাণুরূপে চিরকাল বর্তমান থাকে। অদ্বৈতবাদীরা যে বলে থাকেন, মায়ামুক্ত হলে জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিণত হয়, সেই তত্ত্ব এই শ্লোকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। মায়ামুক্ত হবার পর জীবাত্মা ইচ্ছা করলে ভগবানের দেহ নির্গত ব্রহ্মজ্যোতিতে চিৎকণারূপে বিরাজ করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান জীবাত্মারা ভগবৎ-ধামে প্রবেশ ক'রে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, এমনকি আগুনেও জীবাত্মা রয়েছে।

প্রশ্ন-৮। গীতার এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।। (৩/২১)

উত্তরঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে ভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে। সাধারণ মানুষদের এমনই একজন নেতার প্রয়োজন হয়, যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যে নেতা নিজেই ধুমপানের প্রতি আসক্ত, তিনি জনসাধারণকে ধুমপান থেকে বিরত হতে শিক্ষা দিতে পারেন না। শিক্ষা দেওয়া শুরু করার আগে থেকেই শিক্ষকের সঠিকভাবে আচরণ করা উচিত। এভাবেই যিনি শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় আচার্য অথবা আদর্শ শিক্ষক। তাই জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হয়।

প্রশ্ন-৯। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। (৪/৮)

উত্তরঃ সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ভগবদ্গীতা অনুসারে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ যে মানুষ, তিনি হচ্ছেন সাধু। কোনো লোককে আপাতদৃষ্টিতে অধার্মিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তরে তিনি যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তবে বুঝতে হবে তিনি সাধু। যারা কৃষ্ণভাবনাকে গ্রাহ্য করে না, তাদের উদ্দেশ্যে দৃষ্কৃতাম্ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর ভক্তদের শান্তি বিধান করা। অসুরেরা ভগবানের ভক্তদের নানাভাবে কষ্ট দেয়, তাঁদের উপর উৎপাত করে, তাই তাঁদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবান অবতরণ করেন।

প্রশ্ন-১০। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (৪/১১)

উত্তরঃ যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে। সমস্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানী সাধকের সাধনার বস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তবে যে যেভাবে ভগবানকে পেতে চায়, তার সিদ্ধিও হয় তেমনভাবে। সেখানে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর জ্ঞানে সেবা করে, কেউ তাঁকে সখা বলে মনে ক'রে খেলা করে, কেউ সন্তান বলে মনে ক'রে স্নেহ করে, আবার কেউ পরম প্রিয় বলে মনে ক'রে ভালবাসে। ভগবানও তেমন তাঁদের বাসনা অনুযায়ী তাঁদের সকলের সঙ্গে লীলাখেলা করে তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দেন। ব্রজগোপীকারা যেভাবে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, সেটি হচ্ছে সর্বোচ্চ আরাধনা। তার থেকে শ্রেয় আরাধনা আর নেই। এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ইহাতে মাধুর্যরসের একটু আভাস পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১১। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ।। (৪/১৩)

উত্তরঃ প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এরপরের স্তর হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং এরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তারপরের স্তর হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় বৈশ্য এবং এরা রজো ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তারপরের স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ভগবান যদিও এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মত নন।

প্রশ্ন-১২। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। (৪/৩৪)

উত্তরঃ সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন। পারমার্থিক উপলব্ধির পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। তাই, ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেই সদ্গুরুর শরণাগত হতে, যিনি গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন নি, তিনি কখনোই গুরু হতে পারেন না। ভগবান হচ্ছেন আদি গুরু। পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হয়ে ক্রীতদাসের মত তাঁর সেবা করতে হয়।

প্রশ্ন-১৩। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন।। (৬/৪৬)

উত্তরঃ যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন! সর্ব অবস্থাতেই তুমি যোগী হও। বিভিন্ন পন্থা অনুসারে এই যোগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কর্মের মাধ্যমে যখন চেতনাকে ভগবানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কর্মযোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যখন ভগবানকে জানবার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং ভক্তির মাধ্যমে যখন ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এখানে ভগবান যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

প্রশ্ন-১৪। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (৭/১৪)

উত্তরঃ আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত দিব্য শক্তির অধীশ্বর এবং সেই শক্তিরাজি দিব্যগুণ-সম্পন্ন। জড়া শক্তির প্রভাবে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সে নিজে মুক্ত হতে

পারে না। মুক্ত হতে হলে তাকে এমন কারোর সাহায্য নিতে হয়, যিনি নিজে মুক্ত। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ জীবকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন।

প্রশ্ন-১৫। গীতার এই শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা লিখ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ।। (৮/১৫)
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।। (৮/১৬)

উত্তরঃ মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ ক'রে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেন না তারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

হে অর্জুন। এই ভূবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

যেহেতু এই অনিত্য জড় জগৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত, স্বভাবতই যিনি পরমার্থ সাধন ক'রে কৃষ্ণলোক বা গোলক বৃন্দাবনে পরম গতি লাভ করেন, তিনি কখনই এই জগতে ফিরে আসতে চান না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্যধামে একবার প্রবেশ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। এই জড় জগতে সর্বোচ্চ লোকে অথবা দেবলোকে প্রবেশ করলেও জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীনেই থাকতে হয়। ব্রহ্মলোকে যদি তিনি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন না করেন, তবে তাকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়।

প্রশ্ন-১৬। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ।। (৯/২৫)

উত্তরঃ দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন। যদি কোনো মানুষ চন্দ্র, সূর্য আদি গ্রহলোকে যেতে চায়, তাহলে তার লক্ষ্য অনুসারে বিশেষ বৈদিক বিধান পালন করার ফলে সেখানে সে যেতে পারে। সেখানে স্বর্গলোকের অধিপতি দেবতাদের উপাসনা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেই রকম বিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনই আবার প্রেতলোকে গিয়ে যক্ষ, রক্ষ অথবা পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বর ভগবানের উপাসক শুদ্ধ ভক্ত নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন-১৭। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। (৯/২৬)

উত্তরঃ যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি। অকৃত্রিম প্রেমভক্তি সহকারে এমন কি একটি পত্র অথবা একটু জল অথবা ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করা যেতে পারে এবং ভগবান তা গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট হবেন। কৃষ্ণ কেবল প্রেমভক্তি চান, অন্য কিছু নয়। তিনি অভক্তের কাছ থেকে কোনো রকমের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, শিক্ষিত পণ্ডিত হয়, ধন-বিত্তশালী হয় অথবা বড় দার্শনিক হয়, তবুও তারা কৃষ্ণকে কোনো কিছু নৈবেদ্য গ্রহণ করাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। আমাদের বোঝা উচিত যে, তিনি মাছ, মাংস, ডিম আদি কখনোই গ্রহণ করেন না। যদি তিনি গ্রহণ করতে চাইতেন, তাহলে তিনি সেই কথা বলতেন।

প্রশ্ন-১৮। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ।। (৯/২৭)

উত্তরঃ হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর। শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত কর্ম যেন তাঁর জন্যই করা হয়। জীবনধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়; অতএব সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, এই সব কিছু আমার জন্য কর, আমাকে দান কর, এই কৃষ্ণের আদেশ অনুযায়ী পত্র-পুষ্প-ফল-জল যা কিছু তোমরা খাও, আমাকে নিবেদন ক'রে খাও।

প্রশ্ন-১৯। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।। (১০/১০)

উত্তরঃ যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা ক'রে নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, যাঁরা আমাকে স্মরণ করবেন, তিনি তাকে বুদ্ধিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এখানে সেই বুদ্ধিযোগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি। কেউ যখন তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় সম্যকভাবে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর সেই কার্যকলাপকে বলা হয় বুদ্ধিযোগ।

প্রশ্ন-২০। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।। (১১/৪৫)

উত্তরঃ তোমার এই বিশ্বরূপ, যা পূর্বে কখনও দেখি নাই, তা দর্শন ক'রে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। তাই, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই রূপই আমাকে দেখাও। প্রিয় সখা যেমন তার সখার বৈভব দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, অর্জুনও তেমন আনন্দিত হন। অর্জুন দেখলেন তাঁর প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাঁর অমন বিস্ময়কর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু তখন আবার সেই বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে তাঁর মনে ভয় হয়। যদিও ভয় পাবার তাঁর কোনো কারণ ছিল না, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখাতে। অর্জুন তাঁর সেই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করছেন।

প্রশ্ন-২১। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।। (১১/৫০)

উত্তরঃ মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ ক'রে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে আগ্রহী নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে সেই রূপ দেখালেন এবং তারপর তাঁর দ্বিভুজ রূপ দেখালেন। সৌম্যবপুঃ কথাটির অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর রূপ। ভগবানের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন সকলেই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হতেন। তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনের সমস্ত ভয় বিদুরিত করলেন এবং তাঁকে আবার তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দেখালেন।

প্রশ্ন-২২। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।। (১১/৫১)

উত্তরঃ হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন ক'রে এখন আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। এখানে মানুষং রূপম্ কথাটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদি স্বরূপ হচ্ছে দ্বিভুজ। যারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে ক'রে তাঁকে অবজ্ঞা করে, এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তারা তাঁর দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে বিশ্বরূপ তারপর চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ দেখানো কি ক'রে সম্ভব হত। তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে মনে ক'রে যারা নির্বোধের মত প্রচার করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলছেন, তারা অত্যন্ত অন্যায় করছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্বরূপ ও তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৩। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।। (১১/৫২)

উত্তরঃ তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছো, তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শনাকাঙ্ক্ষী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তাঁর সেই রূপ বহু পূণ্য কর্ম, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ কিংবা দানের মাধ্যমে দর্শন করা সম্ভব নয়। এখানে সুদুর্দর্শম্ কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপটি আরও গোপনীয়। বিশ্বরূপের ঊর্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণের যে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ তা দর্শন করা ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা খুবই দুষ্কর এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা তার থেকে অনেক অনেক বেশি দুষ্কর।

প্রশ্ন-২৪। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।। (১২/২)

উত্তরঃ যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যাঁর মন তাঁর সবিশেষ রূপে আবিষ্ট এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এভাবেই যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তিনি আর কখনও জাগতিক কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্যই সবকিছু করা হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। কখনও তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন, কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রন্ধন করেন, কখনও বা তিনি বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোনো কিছু খরিদ করেন, কখনও তিনি মন্দির অথবা বাসন পরিস্কার করেন, কৃষ্ণ সেবায় কর্ম না ক'রে তিনি এক মূহুর্তও নষ্ট করেন না।

প্রশ্ন-২৫। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।। (১৫/৭)

উত্তরঃ এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হবার ফলে তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে। এই শ্লোকটিতে জীবের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে। সনাতনভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র বিভিন্নাংশ। সনাতনভাবেই জীবসত্তা ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ। বিষ্ণুতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ এবং জীবসত্তা হচ্ছে বিভিন্নাংশ প্রকাশ। বিভিন্নাংশ প্রকাশ জীবসমূহ ভগবানের নিত্য দাস। স্বতন্ত্র আত্মারূপে প্রতিটি জীবেরই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ক্ষুদ্র স্বাধীনতা রয়েছে। সেই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে জীবাত্মা বদ্ধ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-২৬। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।। (১৬/২১)

উত্তরঃ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব ঐ তিনটি পরিত্যাগ করবে। এখানে আসুরিক জীবনের কিভাবে শুরু হয়, তার বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ কাম উপভোগ করবার চেষ্টা করে এবং তার অতৃপ্তিতে তার চিত্তে ক্রোধ ও লোভের উদয় হয়। সুস্থ্য মস্তিষ্ক-সম্পন্ন যে মানুষ আসুরিক জীবনে অধঃপতিত হতে না চায়, তাকে অবশ্যই এই তিনটি শত্রুর সঙ্গ বর্জন করতে হবে। এই তিনটি শত্রু আত্মাকে এমনভাবে হত্যা করে, যার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। মানব জীবনের তিনটি শত্রু—কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মানুষ যতই মুক্ত হয়, তার জীবন ততই নির্মল হয়। ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে রত থাকলেও কখনো কখনো অনৈতিক কার্যে লিপ্ত হয়ে অধ:পতিত হন। এইরূপ হীন ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত ভক্ত চন্দ্রের কলঙ্ক-স্বরূপ। চাঁদ মিষ্টি-মধুর আলো বিতরণ করলেও ইহার কলঙ্ক কখনো মুছে যায় না। তাই, কখনো মনে করা উচিত নয় যে অপ্রাকৃত ভগবৎ-পরায়ণ ভক্ত সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হতে পারে, শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন-২৭। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ।। (১৮/৪০)

উত্তরঃ এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই, যে প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত। দেব-দেবীর উপাসকেরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত নয়। তারাও এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করে। দেবতারাও ত্রিগুণের মধ্যে আবদ্ধ। ভগবান এখানে সারা জগৎ জুড়ে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের যে সমষ্টিগত প্রভাব, তার সারমর্ম বিশ্লেষণ করছেন।

প্রশ্ন-২৮। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ।। (১৮/৪২)

উত্তরঃ শম-মনকে সংযত করা, দম-ইন্দ্রিয়ের বেগকে দমন করা, তপঃ-ধর্মীয় বিষয়ে উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় অনুশীলন ও কষ্ট স্বীকার করা, শৌচ-পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও থাকা, ক্ষান্তি-ক্ষমা করার প্রবণতা, আর্জব-সরলতা তথা কুটীনাটী পরিহার করা, জ্ঞান-সকল প্রকার জ্ঞান অর্জন ও পারদর্শিতা লাভ করা, বিজ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান তা বিশ্বাস করা এবং সকল প্রকার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই প্রকাশিত হয় ও সে বিষয়ে পূর্ণ আস্থা রাখা, আস্তিক্য-সাকার ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা অর্থাৎ নাস্তিক মনোভাব ত্যাগ করা। এগুলি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম।

প্রশ্ন-২৯। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (১৮/৬৬)

উত্তরঃ সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না। ভগবান নানা রকম জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন, ব্রহ্ম জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, পরমাত্মা জ্ঞানের বর্ণনা করেছেন, সমাজ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের বর্ণনা করেছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান, বৈরাগ্যের জ্ঞান, মন ও ইন্দ্রিয়-দমন, ধ্যান আদি সব কিছুরই বর্ণনা করেছেন। তিনি বিবিধ উপায়ে নানা রকম ধর্মের বর্ণনা করেছেন। এখন, ভগবদ্গীতার সারাংশ বিশ্লেষণ ক'রে ভগবান বলেছেন যে, তা সবই পরিত্যাগ করা ও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। সেই শরণাগতি তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে, কেননা ভগবান নিজেই তাঁকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য অন্য কোনো কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-৩০। গীতার এই শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা লিখ।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।। (১৮/৬৮)
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।। (১৮/৬৯)

উত্তরঃ যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতাবাক্য উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ ক'রে নিঃসংশয়ে আমার কাছে ফিরে আসবেন। এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই এবং তাঁর থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না। যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃত জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন এবং কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করার উপায় বর্ণনা করেন, তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

Bhagavatam (BG)

Total teaching hours-50 (60-70 periods) Total questions-42 Total marks-250

(আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীভাগবতমে মুখবন্ধে লিখেছেন—মধ্যযুগের মানব সমাজ অপেক্ষা আজকের মানব সমাজ অনেক বেশি প্রশস্ত, এবং আধুনিক যুগের প্রবণতা হচ্ছে যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্র অথবা একটি মানব সমাজ গড়ে ওঠে। শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ অনুসারে, আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের আদর্শ হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ঐক্য-সাধন করা। মানব সমাজ আজ আর অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে জাগতিক সুখ-ভোগ, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির দ্রুত প্রগতি হয়েছে। কিন্তু তবুও সমাজ-ব্যবস্থায় কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে, এবং তাই অত্যন্ত নগণ্য বিষয় নিয়েও ব্যাপকভাবে কলহ-বিবাদ হচ্ছে। মানব সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা ক'রে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনটি শ্রীমদ্ভাগবত মেটাতে পারে, কেননা এটি হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের ভগবৎ-চেতনার পুনর্বিকাশের এক সাংস্কৃতিক অবদান। স্কুল এবং কলেজগুলিতেও শ্রীমদ্ভাবত সম্বন্ধে শিক্ষাদানের প্রচলন করা উচিত, কেননা মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ছাত্রাবস্থায় সমাজের আসুরিক ভাবধারার পরিবর্তন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।। ভা.৭-৬-১)

প্রশ্ন-১। শ্রীমদ্ভাগবতমে (১-১-১) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।। ১।।

ব্যাখ্যাঃ হে বাসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়—এই বন্দনার মাধ্যমে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণতি নিবেদন করা হচ্ছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর রচিত ব্রহ্ম-সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সামবেদেও বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর দিব্য পুত্র। তাই এই প্রার্থনায়, প্রথমেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যদি কোনো অপ্রাকৃত নামের দ্বারা সম্বোধন করতে হয়, তাহলে তা হচ্ছে কৃষ্ণ, অর্থাৎ সর্বাকর্ষক। ভগবদ্গীতায় বহু স্থানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছেন, এবং তা অর্জুন সত্য বলে সমর্থন করেছেন, এবং নারদ, ব্যাস প্রমুখ সমস্ত মহর্ষিরাও তা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করেছেন। পদ্মপুরাণেও বলা হয়েছে যে, ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামটিই মূখ্য। বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ, এবং বাসুদেব-সদৃশ ভগবানের অন্য সমস্ত রূপেরও উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। বাসুদেব নামটি বিশেষভাবে বসুদেব এবং দেবকীর দিব্য-সন্তানকেই বোঝায়। পরহংসেরা, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস। এই জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু ক'রে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত কেহই স্বাধীন নয়। ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতম্ শুরু হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য—সত্যং পরমহং ধীমহি।

প্রশ্ন-২। শ্রীমদ্ভাগবতমে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীল সূত গোস্বামীকে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন? প্রশ্নগুলি লিখ।

উত্তরঃ শৌনকাদি ঋষিরা সূত গোস্বামীকে ছয় (৬) টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রশ্নগুলি হচ্ছে—

(১) জনসাধারণের পরম মঙ্গল কি এবং কিভাবে ইহা সাধিত হয়?
(২) আত্মা সুপ্রসন্ন অর্থাৎ আত্মার তৃপ্তি সাধন হয় কি প্রকারে?
(৩) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেবকী গৃহে আবির্ভূত হওয়ার কারণ কি?
(৪) ভগবানের অবতার কি কি? ভাগবতমে কয়টি অবতারের উল্লেখ করা হয়েছে? বাইশ (২২) টি অবতারের উল্লেখ আছে।
(৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কি কি? বিস্তারিতভাবে লীলার বর্ণনা করা হয়েছে।
(৬) শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণের পর নিজ ধাম গোলোকে প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কোথায় গেল বা কার শরণাপন্ন হয়েছে?

সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ব্রাহ্মণদের সেই প্রশ্নগুলির উত্তর একে একে দিয়েছিলেন। ছয়টি প্রশ্নের উত্তরের বর্ণনার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতমে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) শ্লোক বর্ণিত হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রীমদ্ভাগবতম প্রথম শুনাইয়াছিলেন গঙ্গার তীরে। সুত গোস্বামীও সভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বার নৈমিষারণ্যে সুত গোস্বামী ঋষিদের সভায় ভাগবত বর্ণনা করেন।

(ভা. ১ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায় এর আরো ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-৩। শ্রীমদ্ভাগবতমে (১-২-১১) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

ব্যাখ্যাঃ পরমতত্ত্বকে তিনরূপে উপলব্ধি করা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা এবং সবশেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে। যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ব বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন। উপনিষদের অনুগামী জ্ঞানীদের কাছে তা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়, যোগীদের কাছে পরমাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে উপলব্ধ হন এবং ভক্তদের কাছে ভগবানরূপে প্রকাশিত হন। এই তিনটি চিন্ময় প্রকাশ সূর্যের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। সূর্যেরও তিনটি বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে, যেমন—সূর্যরশ্মি, সূর্যগোলক ও সূর্যমণ্ডল। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সূর্যকিরণ সম্বন্ধে জেনেই সন্তুষ্ট থাকে। যাঁরা আরো উন্নত স্তরে রয়েছেন, তাঁরা সূর্যগোলকের সম্বন্ধে অবগত। যাঁরা সূর্যমণ্ডলের অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাঁদের জ্ঞান পরম তত্ত্বের সর্বোত্তম সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তিনটি বিভিন্ন স্তরের অন্বেষণকারীরা সমপর্যায়ভুক্ত নন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) ব্রহ্মা বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, কারণ তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, তিনি হচ্ছেন অনাদির আদি পুরুষ গোবিন্দ এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

(গী.২/২ দেখ) (ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (চৈ.চ.আ.লী.১৭-৭৬, চৈ.চ.ম.লী-১, ১২-১৯৪, চৈ.চ.ম.লী-২, ২০-১৫৮ দেখ)।

প্রশ্ন-৪। শ্রীমদ্ভাগবতমে (১-২-১৮) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।। ১৮।।

ব্যাখ্যাঃ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ হৃদয়ের সমস্ত অশুভ প্রবৃত্তিগুলি নির্মল করার উপায় এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপায়টি হচ্ছে ভাগবতের সঙ্গ করা। দু'রকমের ভাগবত রয়েছেন; গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভক্ত-ভাগবত। মানুষ সাধারণত পেশাধারী ভাগবত-পাঠকদের পাঠ শ্রবণ ক'রে বিপথগামী হতেই অভ্যস্ত। তাই উপদেশ দেয়া হয়েছে, পেশাধারী পাঠকদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নয়। ভগবত তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা এবং শিক্ষা লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের সেবা করা হয় দুইটি প্রধান পন্থায় যা হচ্ছে বিধিমার্গে ও রাগমার্গে। বেদ-পুরাণ-উপনিষদ-গীতা-ভাগবত-নারদপঞ্চরাত্রে সাধারণতঃ বিধিমার্গে ভগবানকে সেবা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল বিধিমার্গে সেবা—'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ-কীর্তন ও বিগ্রহ সেবা দ্বারা অভদ্র জিনিসগুলি প্রায় নষ্ট হয়, নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু, সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। অভদ্র জিনিস যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তার প্রভাবে ভক্ত নিষিদ্ধ পাপাচারে লিপ্ত হয়। ভগবানকে রাগমার্গে সেবার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভদ্র জিনিস নষ্ট হয়। ইহা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (ম.লী. ২২-১৪২) লেখা আছে— শুদ্ধ ভক্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি-নিষেধগুলি ত্যাগ ক'রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ভজনা করেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কোনো রকম নিষিদ্ধ পাপ আচরণে তার স্পৃহা থাকে না। বর্ণাশ্রম প্রথা এমনভাবে আয়োজন করা হয়েছে যাতে কেউ কোনো রকম পাপ কর্ম না করে। পাপের ফলেই জীবের ভববন্ধন হয়। কেউ যদি এই জীবনে পাপ কর্ম করে, তাহলে সে তার পরবর্তী জীবনে দণ্ড ভোগ করার জন্য উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। আইনের দ্বারা জোর করে জীবকে পাপকর্ম থেকে বিরত করা যায় না। সুতরাং রাগমার্গে ভগবানের সেবার দ্বারা অভদ্র জিনিসগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। বিধিমার্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও ভগবানের অন্যান্য মূর্ত্তির সেবা হয়, রাধাকৃষ্ণের সেবা হয় না। শুধু রাগমার্গেই রাধাকৃষ্ণের সেবা হয়। "কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ।।" কৃষ্ণ কখনো ব্রজপুর ছেড়ে বাহিরে যান না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাগমার্গে রাধাকৃষ্ণকে সেবা করার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা চৈ.চ.ম.লী-২, ২২-১৪২, আ.লী.৫-১৩১ দেখ)

প্রশ্ন-৫। শ্রীমদ্ভাগবতমে (১-৩-২৫,২৬,২৭) এই তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।।২৫।।
অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।।২৬।।
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ।।২৭।।

ব্যাখ্যাঃ তারপর দ্বাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন। ভগবানের কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তিনি যুগ-সন্ধ্যায়, অর্থাৎ কলিযুগের শেষ এবং সত্য যুগের শুরুতে দুটি যুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হবেন। দেওয়াল-পঞ্জীর (ক্যালেণ্ডার) মাসের মতো সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারটি যুগ আবর্তিত হয়। এই কলিযুগের স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪,৩২,০০০ বছর। তার মধ্যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালের শুরু থেকে ৫,০০০ বছর গত হয়েছে। সুতরাং, কলিযুগের আরো ৪,২৭,০০০ বছর বাকি রয়েছে। সেই সময়ের পর কল্কি অবতারের আবির্ভাব হবে, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁর পিতা হবেন বিষ্ণুযশ নামক এক তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এবং তিনি যে শম্ভল গ্রামে আবির্ভূত হবেন তারও উল্লেখ রয়েছে। বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়. ঠিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন। ভগবানের অবতারের যে তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়। তা কেবল সমস্ত অবতারের আংশিক দিগ্‌দর্শন। আরও অসংখ্য অবতার রয়েছেন, যেমন হয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃষ্ণিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, সার্বভৌম, বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্‌ভানু ইত্যাদি বহু বহু অবতার। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হচ্ছেন, ঠিক যেভাবে জলাশয় থেকে নিরন্তর জল প্রবাহিত হয়। সমস্ত ঋষি, মনু, দেবতা এবং মনুর বংশধরেরা যাঁরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ এবং কলা। প্রজাপতিরাও এই অংশ ও কলার অন্তর্গত। যাঁরা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিসম্পন্ন তাঁদের বলা হয় বিভূতি, এবং যাঁরা অধিক শক্তিশালী তাঁদের বলা হয় আবেশ অবতার।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো চৈ.চ.ম.লী.২,২০-২৩৭→২৪৯)

প্রশ্ন-৬। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্, শ্রীমদ্ভাগবতমে (১-৩-২৮) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।২৮।।

ব্যাখ্যাঃ এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই বিশেষ শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য অবতারদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। ভগবানের বিভিন্ন অবতারেরা সীমিত শক্তি প্রদর্শন করেন, কেন না সেই বিশেষ সময়ে ঠিক ততটুকু শক্তিই প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে অদ্ভুত লীলা হচ্ছে ব্রজগোপীকাদের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস। ব্রজগোপীকাদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সৎ, এবং আনন্দময়। ব্রজগোপীকাদের সঙ্গে তাঁর যে লীলাবিলাস, তা কখনও ভুল বুঝা উচিত নয়।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো দেখ চৈ.চ.আ.লী. ২-৫৬)

প্রশ্ন-৭। শ্রীমদ্ভাগবতমে (১-৫-১৭) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ।।১৭।।

ব্যাখ্যাঃ যদি কেউ তার স্বীয় কর্তব্যকর্ম ত্যাগ ক'রে ভগবানের শ্রীচরণাম্বুজের সেবা করে এবং সেই ভগবৎ-সেবা সম্পূর্ণ না ক'রে অধঃপতিত হয়, তাতে ক্ষতি কি? আর যদি কেউ জড়-জাগতিক সমস্ত কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করে তাতে তার কি লাভ? কিংবা, যেমন খ্রিস্টধর্মীরা বলে থাকেন, 'কোনও মানুষ সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও যদি তার শাশ্বত আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে, তবে তার কি লাভ? ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোনো কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোনো লাভ হয় না। কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে সাময়িক ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে কেউ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হল এবং তারপর অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হল। একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে মহারাজ ভরতকে হরিণ-শরীরে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি সেই হরিণটির কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন। তার ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে অপরাধ করার ফলে মহারাজ চিত্রকেতুও অধঃপতিত হয়েছিলেন। ভগবানের চরণারবিন্দে শরণাগত হওয়ার পর যদি কারো পতনও হয়, তবুও তিনি কখনোই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা বিস্মৃত হবেন না। অজামিল তাঁর প্রথম জীবনে ভক্ত ছিলেন, কিন্তু যৌবনে তাঁর

পতন হয়। কিন্তু তবুও অন্তিম সময়ে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। তা বলে এটি মনে করা উচিত নয় যে, অপ্রাকৃত ভগবৎ-পরায়ণ ভক্ত সব রকম নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন, শাস্তি পেতে হবে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-৮। শ্রীমদ্ভাগবতমে (২-১-৩৭, ২-৫-৩৭) এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা
বিড়রুরঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো
দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম বিতানযোগঃ।।৩৭।।
পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত।।৩৭।।

ব্যাখ্যাঃ ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাটপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়গণ তাঁর বাহু, বৈশ্যগণ তাঁর উরুযুগল, কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণ তাঁর পদাশ্রিত। সমস্ত পূজনীয় দেবতারাও তাঁর অধস্তন, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে সেই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। মানব সমাজের বিভিন্ন বর্ণ বিভাগ, যথা ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান বর্ণ, ক্ষত্রিয় বা শাসকবর্গ, বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণী, সবই পরম ঈশ্বর ভগবানের দেহের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মুখ, ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর জঙ্ঘা এবং শূদ্রেরা তাঁর পদ যুগল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সমস্ত জীবদের ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে তা নির্ণয় করা হয়। মানব সমাজের চারটি বর্ণ যথা বুদ্ধিমান সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণ), পরিচালক বর্গ (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বৈশ্য), এবং শ্রমিক সম্প্রদায় (শূদ্র) হচ্ছে ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণদের, তাই বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে জীবের সঙ্গে ভগবানের এই সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার ক'রে আদর্শ পথে জনসাধারণকে পরিচালিত করা। ক্ষত্রিয় বর্গের কর্তব্য জীবেদের রক্ষা করা যাতে তারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে; ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে খাদ্য শস্য উৎপাদন ক'রে তা সমগ্র মানব সমাজকে বিতরণ করা যাতে জনসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস ক'রে মানব জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে গাভীদের রক্ষা করা। আর শ্রমিক সম্প্রদায়, যারা বুদ্ধিমান নয় অথবা শক্তিশালী নয়, তারা তাদের দৈহিক শ্রমের দ্বারা উচ্চতর বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-৯। শ্রীমদ্ভাগবতমে (২-৬-১৯,২০,২৩,৩২) এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা লিখ।

পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু।।১৯।।
পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্তুপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্‌ব্রতঃ।।২০।।
যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞ সম্ভারান্ পুরুষাবয়বানৃতে।।২৩।।
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ।।৩২।।

ব্যাখ্যাঃ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক-চতুর্থাংশের দ্বারা এই জড় জগৎ প্রকাশ করেছেন, সেখানে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিরাজ করে। ভগবানের সন্ধিনী-শক্তির এক-চতুর্থাংশ জড় জগৎরূপে প্রদর্শিত হয়, আর তিন-চতুর্থাংশ চিজ্জগতে প্রকাশিত হয়। আমি যখন মহাপুরুষের (মহাবিষ্ণু) নাভি পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার কাছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই মহাপুরুষের অবয়ব ব্যতীত অন্য কোনো সামগ্রী ছিল না। তাঁর ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি, শিব সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং নিত্য ভগবানস্বরূপে সবকিছু পালন করেন। তিনি এই তিন শক্তির শক্তিমান নিয়ন্তা। ভগবান বাসুদেব এক, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি ও অংশের দ্বারা জড় জগতে এবং চিন্ময় জগতে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেই সবই তিনি পালন করেন।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-১০। শ্রীমদ্ভাগবতমে (২-৯-৩৩, ৩-৫-২৩) শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।৩৩।।
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।।২৩।।

ব্যাখ্যাঃ হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব। তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের ঈশ্বর। বেদে তাঁকে অন্য সমস্ত নিত্যদের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক পুত্রের সঙ্গে পিতার সম্পর্কের মতো। গুণগতভাবে পিতা এবং পুত্র সমান, কিন্তু তা হলেও পিতা কখনো পুত্র নন, অথবা পুত্র কখনো তার জন্মদাতা পিতা নন। অতএব, পূর্বকৃত বর্ণনা অনুসারে, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু বা হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং জড় প্রকৃতির গর্ভে জীবেদের সঞ্চার ক'রে ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে সজীব করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১৪/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে। সমস্ত জীব ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে বলছেন যে তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। সৃষ্টির পূর্বে কারণোদকশায়ী বা গর্ভোদকশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ছিলেন না, অথবা ব্রহ্মা, শঙ্করও ছিলেন না। জীবেরা ছিল না, জগতকে প্রভাবিত করে যে জড় শক্তি, তাও ছিল না। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে কালচক্রে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, এবং ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যবর্তী অবস্থায় সমস্ত জীব ও জড়-প্রকৃতি ভগবানের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)(আরো ব্যাখ্যা চৈ.চ.ম.লী.২,২১-৫০,৫১,৫২,৫৩,৫৪, চৈ.চ.ম.লী.২,২৫-১০৩)

প্রশ্ন-১১। শ্রীমদ্ভাগবতমে (৩-১৬-১০-১৫, ২-৫-৩২,৩৩, ১-৩-১) এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা লিখ।

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্
গৃধ্রা রুষা মম কুষন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ।।১০।।

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ ক্ষুভিতত্বচঃ।।১৫।।
যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম্।।৩২।।
তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ।।৩৩।।
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।।১।।

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর (শিব) হচ্ছেন প্রকৃতির তিনটি গুণের (রজ, সত্ত্ব ও তম) কার্যকরী অধ্যক্ষ, এবং তাঁরা সকলে উদ্ভূত হয়েছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে। তাঁরা অবতরণ করেন কেবল শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত আনন্দ প্রদানের জন্য। ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং কালে যে সমস্ত বিষ্ণুর অবতারেরা অবতরণ করেন, তাদের কখনো বদ্ধ জীবদের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। বিষ্ণু তত্ত্বদের ব্রহ্মা ও শিবের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়, এমনকি তাদের সমকক্ষ বলেও মনে করা উচিত নয়। যারা তা করে তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে তাঁর পুরুষ-অবতারে বিরাটরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র আদি জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। এইভাবে জড় জগতকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত সৃষ্টির অংশগুলি, যথা পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়-সমূহ, মন এবং প্রকৃতির গুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিত হয়, ততক্ষণ শরীর সৃষ্টি সম্ভব হয় না। কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতি নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে এবং জড় জগৎ সৃষ্টি হয়।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-১২। শ্রীমদ্ভাগবতমে (৩-৩৩-৬,৭, ২-৪-১৮) শ্লোক তিনটির ব্যাখ্যা লিখ।

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎ প্রহ্ণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।। ৬।।
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।। ৭।।
কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।। ১৮।।

ব্যাখ্যাঃ কুকুরভোজী পরিবারে যার জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর লীলা শ্রবণ করে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে অথবা তাঁকে স্মারণ করে, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ্য হয়, অতএব যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁদের আধাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কি আর বলার আছে। আহা! যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা কত ধন্য! কুকুরভোজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এই প্রকার ব্যক্তিরা পূজ্য। যাঁরা আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁরা সর্বপ্রকার তপস্যা এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা আর্যদের সমস্ত সদাচার অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে স্নান করেছেন, বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ করেছেন। কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। শ্বপচ গৃহে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ যোগত্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণে পরিণত হন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যথাযথ ভাবে সংস্কার বা পবিত্র না হলে, তাকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করা হয় না। (ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

(আরো ব্যাখ্যা দেখ গী.২/৪৬,, চৈ.চ.আ.লী. ৭-৭২, চৈ.চ.ম.লী.-১, ৮-৩৬, চৈ.চ.অ.লী. ৪-৭০, চৈ.চ.অ.লী. ৩-১২৩,১২৪)

প্রশ্ন-১৩। শ্রীমদ্ভাগবতমে (৪-৬-৫৩) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।
যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্ ।। ৫৩।।

ব্যাখ্যাঃ হে যজ্ঞনাশক শিব! দয়া ক'রে আপনি আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন এবং কৃপাপূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ হতে দিন। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করার উপদেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, এবং সেই প্রকার কর্ম সম্পাদনকে বলা হয় যজ্ঞ। যজ্ঞ ব্যতীত অন্য যে কর্ম করা হয়, তা ভব-বন্ধনের কারণ হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হলে সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা যেহেতু যজ্ঞের প্রসাদ প্রত্যাশা করেন, তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ মূলক জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত, তাদের পক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য, তা না হলে তারা তাদের সেই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। প্রজাপতি দক্ষ তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, এবং শিব তাঁর ভাগ প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু শিবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, তাই উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন কার্য, কারণ যজ্ঞে সমস্ত দেবতাদের অংশগ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই কলিযুগে সেই প্রকার ব্যয় সাপেক্ষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, এমনকি সেই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য দেবতাদেরও নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কলিযুগে বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে “হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র” কীর্তন করা।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-১৪। শ্রীমদ্ভাগবতমে (৪-২৪-২৮, ২৯) শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে।। ২৮।।

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে।।২৯।।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীশিব বললেন—যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতি ও জীব আদি সব কিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মানুষ শত জন্ম ধরে যথাযথ ভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হন, এবং তিনি যদি তাঁর থেকেও অধিক যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহলে তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি অনন্য ভক্তিসহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন, তিনি অচিরেই চিৎ-জগতে উন্নীত হন। আমি ও অন্যান্য দেবতারা এই জড়-জগতের বিনাশের পর সেই লোক প্রাপ্ত হই। স্ব-ধর্মনিষ্ঠঃ, অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, অথবা শূদ্র হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; কেউ যদি তার স্বীয় বর্ণে অবিচলিত থেকে যথাযথভাবে তার বিশেষ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে তাকে সভ্য মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে। তা না হলে সে একটি পশুর তুল্য। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মানব-সমাজে যাঁদের চেতনা বিকশিত হয়েছে, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা, যাতে দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোক অথবা কৃষ্ণলোকে তাঁরা উন্নীত হতে পারেন।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-১৫। শ্রীমদ্ভাগবতমে লিখিত (৪-৩০-৪২) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নমঃ সমায় শুদ্ধায় পুরুষায় পরায় চ।
বাসুদেবায় সত্ত্বায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ।।৪২।।

ব্যাখ্যাঃ হে ভগবান! কেউই আপনার শত্রু নয় অথবা মিত্র নয়। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। আপনি পাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হতে পরেন না, এবং আপনার চিন্ময় রূপ জড়া প্রকৃতির অতীত। আপনি পরমেশ্বর ভগবান কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত। তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও তিনি এই জড়-জগতের সর্বত্র বাস করেন, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই ঈশোপনিষদে ভগবানকে অপাপ-বিদ্ধম্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অসুরদের সংহার করেন, এবং এমন সমস্ত কার্য করেন যা বেদে অনুমোদিত হয়নি, অর্থাৎ যে সমস্ত কার্যকে পাপ কর্ম বলে মনে করা হয়। যদিও তিনি এইভাবে কার্য করেন, তবুও তিনি তাঁর কর্মের দ্বারা কলুষিত হন না। ভগবান সম, অর্থাৎ যিনি সকলের প্রতি সমদর্শী।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-১৬। শ্রীমদ্ভাগবতমের (৫-৫-১) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্ ।।১।।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ ক'রে, কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। এই প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয়, এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন করা। সরকার, পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের অধীনস্থদের কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার শিক্ষা দান করা। কৃষ্ণভক্তিহীন মানুষ কুকুর এবং শূকরের থেকে মোটেই উন্নত নয়। বর্তমান যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার শিক্ষা দিচ্ছে, এবং তাদের জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। তার এই কঠোর পরিশ্রমের জীবনে একমাত্র সুখ হচ্ছে একটুখানি মৈথুন। এই প্রকার জীবন যাপন করা মানুষের উদ্দেশ্য নয়। এই প্রকার সুখ তো কুকুর এবং শূকরদেরও লাভ হয়।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-১৭। শ্রীমদ্ভাগবতমের (৫-৫-১৮) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দৈবং ন তৎস্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন

মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ।। ১৮।।

ব্যাখ্যাঃ যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়। সেই গুরু গুরু নন, সেই স্বজন স্বজন নন, সেই পিতা পিতা নন, সেই মাতা মাতা নন, সেই উপাস্য দেবতা দেবতা নন, অথবা সেই পতি পতি নন—যদি না তিনি তাঁর আশ্রিত জনকে আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে পারেন। পিতা, মাতা, গুরু, পতি, অথবা আত্মীয়-স্বজন সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে জীবকে সাহায্য করা। ঋষভদেব উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তাঁর শিষ্যকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাহলে তাঁর গুরু হওয়া উচিত নয়। ঋষভদেবের এই উপদেশের বহু দৃষ্টান্ত আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। সংসার আবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পারেননি বলে, বলি মহারাজ তাঁর গুরু শুক্রাচার্যকে ত্যাগ করেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত না হলে সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। যিনি তা পারেন না, তার পক্ষে গুরু, পিতা, পতি, মাতা হওয়া উচিত নয়। তাই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করেছিলেন। সংসার চক্ররূপ আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে না পারার ফলে, পত্নীর পতিকে ত্যাগ করার এটিই হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত, তেমনই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতাকে ত্যাগ করেছিলেন, এবং ভরত তাঁর জননীকে ত্যাগ করেছিলেন। সাধারণত গুরুদেব, পতি, পিতা, মাতা এবং গুরুবর্গীয় আত্মীয়-স্বজনেরা কনিষ্ঠদের পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু এখানে ঋষভদেব তা নিষেধ করেছেন। প্রথমে পিতা, গুরু অথবা পতিকে অবশ্যই আশ্রিতদের জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতে হবে। তা যদি তাঁরা না পারেন, তাহলে তাঁদের অবৈধ কর্মের জন্য তাঁদের কলঙ্কের সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে হবে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো দেখ চৈ.চ.ম. লী-১, ৩-১৮১)

প্রশ্ন-১৮। শ্রীমদ্ভাগবতমের (৫-৬-১৮) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ।। ১৮।।

ব্যাখ্যাঃ হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডব ও যদুদের পালক। তিনি আপনাদের গুরু, ইষ্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোনো কোনো সময় আপনাদের বার্তাবহ দূত অথবা কিঙ্করের কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। শ্রীকৃষ্ণ যদিও কুরুবংশে অবতীর্ণ হন নি, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের ভক্তিতে এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডব পরিবারের পালক এবং গুরুরূপে আচরণ করেছিলেন। যদুবংশে জন্মগ্রহণ করলেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। পাণ্ডবদের ভক্তিতে ঋণী হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের দূত হয়েছিলেন, এবং বহু বিপদজনক অবস্থায় তাঁদের পরিচালনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তি দান করেন না। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ভক্তিযোগ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সবচাইতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপণের ভিত্তি। তা মুক্তির থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা চৈ.চ.আ.লী. ৮-১৯)।

প্রশ্ন-১৯। শ্রীমদ্ভাগবতমে (৬-২-৪৯) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।

অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।। ৪৯।।

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুর সময় অজামিল তার পুত্রকে সম্বোধন ক'রে ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবৎধামে ফিরে গিয়েছিলেন, অতএব যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে এবং নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁরা যে ভগবত ধামে ফিরে যাবেন, সে সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? অজামিল তাঁর পুত্রের নামকরণ করেছিলেন নারায়ণ এবং যেহেতু তাঁর সেই পুত্রটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাই তিনি বার বার তাঁর নাম ধরে ডাকতেন। তাঁর পুত্রকে সম্বোধন ক'রে ডাকলেও সেই নাম ছিল অনন্য প্রভাবসম্পন্ন, কারণ নারায়ণের নাম পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ থেকে অভিন্ন। অজামিল যখন তার পুত্রের নারায়ণ নামকরণ করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল এবং তাঁর পুত্রের নাম ধরে ডাকার ছলে তিনি শত সহস্রবার নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করেছিলেন। ৮৮ (আটাশি) বৎসর দীর্ঘ আয়ু অতিক্রান্ত হ'লে মৃত্যুর সময় যমদূতেরা এসেছিল অজামিলকে নিয়ে যেতে। অজামিল তাঁর পুত্র নারায়ণকে ডেকে ছিল। তখন বিষ্ণুদূতেরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে বাধা

দিয়েছিলেন। তখন যমদূতেরা ফিরে যায়। এই ঘটনার পর অজামিল হরিদ্বারে এসে একটি বিষ্ণু মন্দিরে ভক্তিযোগ সাধন করেন। তখন বিষ্ণুদূতেরা পুনরায় অজামিলের কাছে আসেন। বিষ্ণুদূতদের দর্শন ক'রে অজামিল গঙ্গার তীরে জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। বিষ্ণুদূতদের দর্শন ক'রে অজামিল হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময়স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভগবৎ পার্ষদের উপযুক্ত ছিল।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-২০। শ্রীমদ্ভাগবতমে (৬-৩-১২,১৩) এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবদ্‌যত্র বিশ্বম্ ।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ।। ১২।।
যো নামভির্বাচি জনং নিজায়াং
বধ্নাতি তন্ত্র্যামিব দামভির্গাঃ।
যস্মৈ বলিং ত ইমে নামকর্ম-
নিবন্ধবদ্ধাশ্চকিতা বহন্তি।। ১৩।।

ব্যাখ্যাঃ হে দূতগণ, তোমরা আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমার উর্ধ্বে এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের উর্ধ্বে একজন পরম ঈশ্বর ও নিয়ন্তা রয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব, যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অধ্যক্ষ, তাঁরা তাঁরই অংশ। বস্ত্রে সূত্রের মতো এই বিশ্ব তাতে ওতোপ্রোতভাবে অবস্থিত। বলদ যেমন নাসিকা-সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র জগৎও তেমনই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যমদূতদের সন্দেহ হয়েছিল যে, যমরাজেরও উর্ধ্বে কোনো শাসক রয়েছেন। তাদের সেই সংশয় দূর করার জন্য যমরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, সকলের উপরে একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন"। তাঁর নিয়ন্ত্রণ কেবল কিছু জীবেরই উপর। অন্যান্য বহু দেবতা রয়েছেন যাঁরা অন্যান্য বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তাঁদের সকলের উর্ধ্বে রয়েছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ। তাই সকলের উর্ধ্বে যে একজন পরম নিয়ন্তা রয়েছেন, সেই কথা বলে, যমরাজ তাঁর সহকারী যমদূতদের সংশয় দূর করেছিলেন।

গরুর গাড়ির চালক যেমন নাসা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা বলদদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই ভগবান বেদবাক্যরূপী রজ্জুর দ্বারা সমস্ত মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, যা মানব-সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আদি বিভিন্ন নাম এবং কর্ম অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। ভয়ে ভীত হয়ে, এই সমস্ত বর্ণের মানুষেরা তাদের স্বীয় কর্ম অনুসারে ভগবানকে পূজোপহার প্রদান করেন। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা এবং বেদের নির্দেশ অনুসারে তার কর্তব্য পালন করা।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-২১। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ।। (৬-৩-১৯)
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।। (৬-৩-২২)

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃত ধর্ম স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রণীত। সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন, সেই মহান ঋষিগণও তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। দেবতা অথবা প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তা জানেন না, তা হলে অসুর, মানুষ, বিদ্যাধর এবং চারণদের আর কি কথা। ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তিযোগ, তাই মানব সমাজে জীবের পরম ধর্ম। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান প্রদত্ত ধর্মই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। সেই তত্ত্ব ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত হয়েছে, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ--অন্য সমস্ত কর্তব্য বা ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া উচিত। মুর্খেরা প্রচার করে যে, যে কেউ তার নিজের মনগড়া ধর্মমত তৈরী করতে পারে। কিন্তু সেই ধরণের মতবাদ এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। কেউ যদি যথার্থই ধর্ম আচরণ করতে চান, তাহলে তাকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ধর্ম মানুষের তৈরী নয়, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের আইন। তাই, কোনো মানুষ কখনো ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে না, তা তিনি যত বড় মহাপুরুষই হোক না কেন।

(আরো ব্যাখ্যা দেখ, গী.৪-৩৪, চৈ.চ.ম-১, ১১-১৯)

প্রশ্ন-২২। শ্রীমদ্ভাগবতমের শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।। (৬-৩-২০)
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।। (৬-৩-২১)

ব্যাখ্যাঃ ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল (দেবহুতি-পুত্র), স্বয়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি যমরাজ--আমরা এই বারোজন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানি। হে ভৃত্যগণ, এই দিব্য ধর্ম যা ভাগবত ধর্ম বা ভগবৎ প্রেমধর্ম নামে পরিচিত, তা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত নয়। তা অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পান, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। ভগবানের দেওয়া আইন প্রকৃত ধর্ম পরম্পরার ধারায় দ্বাদশ মহাজনদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গের দেব-দেবীরা অথবা অসুরেরা, সিদ্ধপুরুষেরা, বিদ্যাধরেরা, চারণেরা, কেউই ধর্ম তৈরী করতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পন্থা। ধর্মতত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য এবং তা সব রকম জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত, তাই তা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য। মনগড়া একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন ক'রে আমরা কখনোই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। একদল মূঢ় প্রতারক নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন ক'রে লোক ঠকায়।

(আরো ব্যাখ্যা দেখ, গী.৪-৩৪, চৈ.চ.ম-১, ১১-১৯)

প্রশ্ন-২৩। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেস্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।। (৬-১৭-২৮)

ব্যাখ্যাঃ ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনো জীবনের কোনো অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল। তাঁরা নারায়ণপর, তাঁরা কেবল নারায়ণের উপর নির্ভর করেন। তাঁরা জীবনের ব্যর্থতায় কখনো বিচলিত হন না। তাঁরা স্বর্গে থাকেন অথবা নরকে থাকেন তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না, তাঁরা কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতে চান। তাই তাঁরা মহান। স্বর্গলোকে উন্নতি, জড়-বন্ধন থেকে মুক্তি এবং নরক যন্ত্রণা, ভক্তের কাছে সমান। ভক্ত কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আসক্ত হতে চান এবং তাঁর অপ্রাকৃত সেবা করতে চান। যাঁরা নারায়ণপর শুদ্ধভক্ত নন, তাঁরা জড়জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত হ'তে বাধ্য, কিন্তু কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় আসক্ত ভগবদ্ভক্তেরা কখনোই সেগুলির দ্বারা বিচলিত হন না। ভক্তেরা ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে একাগ্র থাকেন, তাই তাঁরা এই জড়-জগতের দ্বন্দ্বভাবজনিত তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন না।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ, ভা.৬-১৭-২৯, চৈ.চ.ম-২, ১৯-২১৬)

প্রশ্ন-২৪। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা লিখ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।। (ভা.৭-৫-২৩)
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।। (ভা.৭-৫-২৪)

ব্যাখ্যাঃ প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—ভগবানের দিব নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ ও কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবধা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। যিনি এই কার্যে যুক্ত হয়েছেন, বুঝতে হবে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা অর্জন করেছেন। অপরাধ শূণ্য হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধাভক্তি কেবলমাত্র একবার নিরাপরাধে ভগবানের নাম গ্রহণ করার ফলেই সম্পাদিত হয়। এমন নয় যে কেবল একজন মানুষ অথবা কেবল ব্রাহ্মণেরাই ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করতে পারে। যদিও স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রদের কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব'লে মনে করা হয়, তবুও তারাও ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই নববিধা ভক্তি অনুশীলনের পৃথক স্থানস্বরূপ দ্বীপগুলি হচ্ছে—(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫) কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ, (৮) মোদ্রুমদ্বীপ, (৯) রুদ্রদ্বীপ।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

(আরো ব্যাখ্যা দেখ, চৈ.চ.আ. ১৩-১৫, চৈ.চ.ম-১, ৮-২৪৫, ৫-৭৬, চৈ.চ.ম-২,১৫-১০৭, চৈ.চ.অ.৪-৭০,১১-১০৫)

প্রশ্ন-২৫। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।। (৭-৯-১০)

ব্যাখ্যাঃ বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত অথচ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-বিমুখ অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাঁর মন, বাক্য, কর্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ভক্ত তাঁর কুল পবিত্র করতে পারে, কিন্তু সেই অতি গর্বান্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। যারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত হওয়ার ফলে নিজেকে পর্যন্ত পবিত্র করতে পারে না, তাদের পক্ষে তাদের কুলকে পবিত্র করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অতি নীচ কুলোদ্ভূত চণ্ডাল যদি শরণাগত হন, তাহলে তিনি তাঁর সমগ্র কুলকে পবিত্র করতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর পরিবার, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারেন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ানরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তি পন্থা অবলম্বন করার ফলে তাদের পরিবারকে পবিত্র করেছে। মুর্খেরা বলতে পারেন যে, ভক্তেরা তাঁদের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে পলায়ণপর হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তেরাই তাঁদের পরিবারের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তাই তিনি সর্বদাই শ্রেষ্ঠ।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ, চৈ.চ.ম-২, ২০-৫৯)

প্রশ্ন-২৬। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ।। (৮-১-১০)

ব্যাখ্যাঃ এই জগতে যেখানে স্থাবর এবং জঙ্গমপ্রাণী রয়েছে, সেখানেই ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই তিনি যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন, কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত; কখনো অন্যের ধন সম্পত্তি আকাঙ্খা করা উচিত নয়। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমরা স্বাধীন, পক্ষান্তরে, আমাদের বোঝা উচিত যে ভগবানের সম্পত্তির একটি অংশ আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। সব কিছুই ভগবানের, এই উপলব্ধির দ্বারা আধুনিক সমাজের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রসংঘের ধারণার সংশোধন করা সম্ভব। এই বিশ্বজনীন সাম্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। সব কিছুই ভগবানের তাই অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অধিকার করা উচিত নয়। কেউ তার মালিকানা দাবী করতে পারে না। এটিই হচ্ছে আদর্শ সাম্যবাদ। প্রাণ ধারণের জন্য যতখানি অর্থের প্রয়োজন হয় ততটুকুই অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার করা হলে চুরি করা হয় এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডনীয় হয়। কেহ যদি অন্যের বরাদ্দতে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে সে একটি চোর। কেউ যদি মনে করে যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোনো অংশ তার সম্পত্তি, তাহলে সে একটি চোর এবং চোরের সমাজরূপে অভিশপ্ত হবে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ, চৈ.চ.ম-২, ২৫-১০১)

প্রশ্ন-২৭। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

শ্রীভগবানুবাচ-

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।। (৯-৪-৬৩)

সাধব হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।

মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।। (৯-৪-৬৮)

ব্যাখ্যাঃ ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—আমি সম্পূর্ণভাবে আমার ভক্তের অধীন। প্রকৃতপক্ষে আমার কোনোই স্বাতন্ত্র্য নেই। যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাই আমি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করি। আমার ভক্তের কি কথা, যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছুই জানি না। ব্রহ্মা, শিব আদি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান ব্যক্তিরা ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ভগবান সর্বতোভাবে তাঁর ভক্তের অধীন। কেন? কারণ ভক্ত অন্যাভিলাষিতাশূণ্য অর্থাৎ, তাঁর হৃদয়ে কোনো রকম বাসনা নেই। তাঁর একমাত্র বাসনা সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করা এবং কিভাবে ভগবানের সেবা করা যায় সেই কথা চিন্তা করা। এই দিব্যগুণের জন্য, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তদের প্রতি অতীব অনুকম্পাপরায়ণ, কেবলমাত্র ভক্তগণই নন, ভক্তেরও ভক্তবৃন্দের প্রতি তিনি কৃপাময়। ভক্তের ভক্ত না হলে কখনো জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ, গী. ৭-১৮)

প্রশ্ন-২৮। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ।। (৯-৪-৬৭)
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।। (৩-২৯-১৩)

ব্যাখ্যাঃ আমার ভক্তরা আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদা পরিতৃপ্ত, তাই তাঁরা চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি) স্বয়ং উপস্থিত হলেও তাঁরা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গলোকে উন্নতি আদি অনিত্য জড় সুখের কি আর কথা? আমার সেবার প্রভাবে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হলেও, আমার সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন আমার ভক্তরা সেগুলি গ্রহণ করেন না। তখন কালের দ্বারা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায় যে সুখ, তাই তাঁরা গ্রহণ করবেন কেন? শুদ্ধ ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না, যা নির্বিশেবাদীরা কামনা করেন। তিনি কখনো ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তি স্বীকার করেন না। এই প্রকার একত্ব বা ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়াকে বলা হয় কৈবল্য। এই প্রকার কৈবল্যজনিত সুখ শুদ্ধ ভক্তের কাছে নরকের থেকেও নিকৃষ্ট। শুদ্ধ ভক্ত যখন চিৎ-জগতে উন্নীত হন, তখন তিনি চার প্রকার সুযোগ লাভ করেন। ভগবান তাঁর বিভিন্ন বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকে বাস করেন এবং তাদের মধ্যে সর্ব প্রধান হচ্ছে কৃষ্ণলোক। শুদ্ধ ভক্তকে সাযুজ্যমুক্তিসহ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি দান করা হলেও, তাঁরা তা গ্রহণ করেন না। স্বর্গলোকে বসবাসের মতো ব্রহ্মসাযুজ্যও কালের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং অনিত্য। চিৎ-জগতের কৃষ্ণ লোকে বাৎসল্যরস পর্যন্ত সেবা ক'রে যে সুখ পাওয়া যায়, তা কালের প্রভাবে নষ্ট হয়। কালের আর এক নাম হচ্ছে ভগবান। এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা হয় না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের সেবা করার সুখ কালের দ্বারা নষ্ট হয় না। ব্রজপুরে কুঞ্জলীলায় গোপী-সখী-মঞ্জরীগণসহ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের খেলা কালের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ ভা.৩-২৯-১৩, চৈ.চ.আ.৪-২০৫-২১৫ পর্যন্ত)

প্রশ্ন-২৯। শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ। (V/Uপ্রশ্ন-৩ মনোযোগ সহকারে পাঠ কর।)

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বানংসমপি কর্ষতি।। (৯-১৯-১৭)

ব্যাখ্যাঃ মাতা, কন্যা, ভগ্নী, অন্য স্ত্রীলোক কিংবা নগ্ন অবস্থায় একসঙ্গে একই আসনে বা একই ঘরে অথবা নির্জনে উপবেশন করা বা শয়ন করবে না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তা বিদ্বান ব্যক্তিকেও যৌনজীবনে আকৃষ্ট করতে পারে। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, তা শিখলেও যৌন আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সাধারণত মানুষ মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না, কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসলে যৌন আকর্ষণের উদ্রেক হতে পারে। এটি একটি মনস্তাত্বিক তথ্য। জাগতিক অথবা আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিও কামবাসনার দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। তাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত এবং ভাগবতের নির্দেশ পালন করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, বিশেষ ক'রে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার পর। কামবাসনা ত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত মন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে না। বহু বিপথগামী মানুষ রয়েছে যারা তাদের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য বৃন্দাবনে বাস করে, কিন্তু তাদের অবস্থা বানর এবং শূকরদের থেকে অবশ্যই শ্রেয় নয়। সর্বতোভাবে পাপ থেকে মুক্ত না হলে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতামে বলা হয়েছে, প্রতিটি জীবের দেহ চব্বিশটি জড় বস্তু দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিনটি বস্তুকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে। তাই আমরা স্ত্রী ও পুরুষ সকল জীব নরকের দ্বারে বসে আছি। আমাদের একটু ভুল হলে, এই তিনটি লোভনীয় বস্তুর আকর্ষণে আমরা নরকের মধ্যে প্রবেশ করব। নরকের দ্বারে এই তিনটি বস্তুর আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করা। নরকের দ্বার থেকে ফিরে আসার আর কোনো মন্ত্র নাই। কাম বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে বৃন্দাবনে প্রেমরসের আশ্রয় গ্রহণ করা। বৃন্দাবনে প্রেমরসের স্থায়ীভাব চিত্তদ্রব। দ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নেই। সুতরাং মঞ্জরীভাবের সাধনায় একদিকে দেহাত্ম বুদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং অন্যদিকে কামের প্রভাবও পরাহত হয়। মঞ্জরীভাবের সাধনা হচ্ছে মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করা।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ ২-১-৩,৩-৩০-২৯,৯-২০-২২)

(আরো ব্যাখ্যা দেখ ভা.৬-১৮-৫১, চৈ.চ.ম-২, ২২-১৪২, চৈ.চ.অ. ৫-৪৫,৪৬, মনু-সংহিতা.২/২১৫)

প্রশ্ন-৩০। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতমের শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা একটি paragraph এর মধ্যে লিখ।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ।।
(ভাঃ ১০-২-১৬)
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী ।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ।।
(ভাঃ ১০-২-১৮)

ব্যাখ্যাঃ পৃথিবী যখন রাজবেশধারী অসুরদের অসংখ্য সৈনের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন মাতা বসুন্ধরা একটি গাভীর রূপ ধারণ ক'রে ক্রন্দন করতে করতে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেছিলেন। মাতা ধরিত্রীর দুঃখের কথা শ্রবণ ক'রে, ব্রহ্মা মহাদেবসহ অন্যান্য দেবতা ও মাতা ধরিত্রীকে নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গিয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে পুরুষসুক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেছিলেন। ব্রহ্মা আকাশে ধ্বনিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ ক'রে দেবতাদের বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে স্বয়ং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং ভক্তদের সমস্ত ভয় বিনাশকারী ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যসহ বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধানকারী ভগবান তাঁর অংশসহ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। ভগবান দেবকীর হৃদয়ে কোনো সাধারণ বিধির দ্বারা স্থানান্তরিত হননি, দীক্ষার দ্বারা হয়েছিলেন। তাই এখানে দীক্ষার মহত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বদা যিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই প্রকার উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দীক্ষিত না হ'লে, হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। কখনোই মনে করা উচিত নয় যে, বসুদেব কর্তৃক বীর্যাধানের ফলে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবানের শাশ্বত রূপ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিল, ঠিক যেভাবে অস্তগামী সূর্যের কিরণ পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান পূর্ণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের শরীর থেকে দেবকীর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সাধারণ জীবের মতো জন্মের বাহিরে। দেবকীর অন্তরে বিরাজমান থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব দ্বারা কারাগৃহ আলোকিত হয়েছিল। তারপর শ্রীবিষ্ণু গভীর রাত্রির অন্ধকারে দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নিজেকে একটি দ্বিভুজ শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন— কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ চৈ.চ.আ.লী.১৩-৮৬)

প্রশ্ন-৩১। শ্রীমদ্ভাগবতমে লিখিত এই শ্লোক দুইটির ব্যাখা লিখ।

যেইন্যেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোইনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।।
(ভাঃ ১০-২-৩২)

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ।।
(ভাঃ ১০-১৪-৪)

ব্যাখাঃ হে পদ্মলোচন! অভক্তরা পরম পদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা অবলম্বন ক'রে নিজেদের মুক্ত ব'লে মনে করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি না থাকায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা তাদের কল্পিত পরম পদ থেকে অধঃপতিত হয়, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মকে অনাদর করেছে। তারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে মায়াতীত পরম পদ ব্রহ্ম পর্যন্ত আরোহণ ক'রে ভগবদ্ভক্তির অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়। ভক্ত ব্যতীত কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, পরার্থবাদী, পরোপকারী, রাজনীতিবিদ্, নির্বিশেষবাদী, শূণ্যবাদী প্রভৃতি বহু অভক্ত রয়েছে, যারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন না ক'রে তাদের নিজেদের মনগড়া মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবন করে। তারা যদিও ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও তারা অধঃপতিত হয়। কিছু মানুষ প্রচার করে—"যত মত তত পথ, যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, চরমে সেই সমস্ত পন্থাই পরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে", কিন্তু এই শ্লোকে সেই মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে। বিমুক্তমানিনঃ হচ্ছে তারা, যারা মনে করে যে, তারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। এখানে যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ বলতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যুগলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে অধঃপতিত হতে হবে (পতন্তি অধঃ), এমনকি মুক্ত অবস্থা থেকেও।

হে ভগবান, আপনার প্রতি ভক্তি আত্ম-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। যদি কেউ সেই পন্থা পরিত্যাগ ক'রে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনে যুক্ত হয়, সে কেবল ক্লেশকর পন্থাই শিকার করে এবং তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। শূণ্য তুষে প্রহার ক'রে কেউ যেমন শস্য লাভ করতে পারে না, তেমনই জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয় না। সে একমাত্র ক্লেশই লাভ করে।

ভগবদগীতায় (১২/৫) শ্লোকে বলা হয়েছে—যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়। যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার প্রয়াসী, তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী এবং যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের যে

উপাসনা তা সগুণ উপাসনা। ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড় গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ গীতা-১২/৫) (আরো ব্যাখ্যা চৈ.চ.ম.লী.২,২২-৩০, অন্ত্যলীলা, ৩-২৫৭ দেখ)

প্রশ্ন-৩২। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট ঋণী আছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা, ঋণী থাকা ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতমে (১০-৩২-২২) শ্লোকটির ব্যাখ্যা লিখ।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লেখা আছে—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে ।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ।।
(চৈ.চ.আ.লী. ৪-১৭৭)

আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রতিজ্ঞা আছে, যে যেভাবে তাঁর ভজনা করবেন, তিনিও তার প্রতি সেভাবেই আচরণ করবেন।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ।।
(চৈ.চ.ম.লী. ৮-৯০)

শ্রীকৃষ্ণের একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁকে যেভাবে ভজনা করবেন, তিনিও তাকে সেভাবে ভজন করবেন।

এই প্রতিজ্ঞা বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতা গ্রন্থে (৪/১১) ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।।

যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

গীতার গান

যেভাবে যে ভজে মোরে আমি সেই ভাবে ।
যথাযোগ্য ফল দিই আপন প্রভাবে ।।
আমাকেই সর্ব মতে চাহে সব ঠাই ।
আগুপিছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই ।।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ঋণী থাকা বিষয়ে বলা হয়েছে—

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে।।
(চৈ.চ.আ.লী. ৪-১৭৯)

ব্রজগোপিকাদের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন।

এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে ।
অতএব 'ঋণী' হয় কহে ভাগবতে ।।
(চৈ.চ.ম.লী. ৮-৯২)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, মাধুর্যরসে যে কৃষ্ণপ্রেম, তার প্রতিদান শ্রীকৃষ্ণ যথাযথভাবে দিতে পারেন না, তাই তিনি সেই ধরনের ভক্তদের কাছে ঋণী থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের শ্রীমুখে বলেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ।।
(ভা. ১০-৩২-২২)

ব্যাখাঃ হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল প্রেম সেবার ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্চেছদ্য সংসার বন্ধন ছিন্ন ক'রে, আমার আরাধনা করেছ। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক। বিরহকাতর গোপীদের আকুল আবেদন শুনে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেন।

পথ একটি, মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ গন্তব্য স্থান ভিন্ন। শেষ গন্তব্য স্থান (ultimate goal) হচ্ছে 'ব্রজপুর'।ব্রজগোপিকারা ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং চৈতন্যমহাপ্রভুও সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ব্রজগোপিকারা যেভাবে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, সেটিই হচ্ছে সর্বোচ্চ আরাধনা। তার থেকে শ্রেয় আরাধনা আর নেই। সেই আরাধনা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহভাবে আরাধনা।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ গীতা- ৪-১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা) (আরো ব্যাখ্যা দেখ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে চৈ.চ.আ.লী. ৪-১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০ এর ব্যাখ্যা/ চৈ.চ.ম.লী.-১,৮-৯০) (আরো দেখ সাধ্য-সাধনগ্রন্থে মাথুর অধ্যায়)

প্রশ্ন-৩৩।শ্রীমদ্ভাগবতমে এই শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য অধ্যায়ে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে ইহার ব্যাখ্যা লিখ।

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্।।
(ভাঃ ১০-৩৩-৩)

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।
(ভাঃ ১০-৩৩-৩০)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ।।
(ভাঃ ১০-৩৩-৩৬)

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ।।
(ভাঃ ১০-৩৩-৩৯)

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ রাসনৃত্য অধ্যায়) (আরো ব্যাখ্যা দেখ চৈ.চ.ম.লী.-১, ৮/৮০-৮১ ব্যাখ্যা)

যোগমায়া আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া

His spiritual potency (Yoga Maya)
His internal potency (The Young Gopis)
The Gopis went forward, each unknown to others. (ভা.১০-২৯-৪)

When the Gopis meditated on Lord Achyuta, He became manifest and personally came to them and they experienced great joy by embracing His body, which was full of transcendental love for them. The Gopis also experienced great joy by exhibiting personal characteristics and a sense of identification appropriate to such love. (ভা.১০-২৯-১০,১১)

Krishna embraced the Gopis. (ভা.১০-২৯-৪৫,৪৬)

The Gopis became proud and each of them thought herself the best woman on earth. (ভা.১০-২৯-৪৭)

Seeing the Gopis too proud, He disappeared. (ভা.১০-২৯-৪৮)

His potencies are unlimited. All these potencies, taking personal forms, engaged Lord Krishna in his pastimes. By His desire His spiritual potency Yogamaya manifests the Gopis. (ভা.১০-৩৩-১৬)

Lord Sri Krishna made up his mind to sport with the Gopis shielded by Yogamaya.
This was the very first precaution, taken by the Lord in connection with Rasa Kreeda.
The other precaution was, that Lord Krishna called into full play, His powers of Yoga.
They formed so many thousands on a miniature scale, come face to face Parabrahman, which has decided to associate Himself with them freely and inspire them with full spiritual energy in the Spiritual Dance. One of the fundamental aims of Rasa Kreeda, is to draw away and attract and

absorb the abundant store of Spiritual Force, which lies hidden and concealed within the Avatarapurusa, protected and fortified, as it is, by Yogamaya Devi.

[BRINDAVANA SRI KRISNA-by-Ch. Gopinathan, Sree Gaudiya Math, Madras] (ভা.১০-৩৩-৩,৪,৫)-যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

প্রশ্ন-৩৪।শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে উদ্ধব বৃন্দাবন যান এবং গোপীদের সঙ্গে কথোপকথন হয়। এই প্রসঙ্গে ভ্রমর সঙ্গীতে শ্রীমতী রাধারাণীর দশদশার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ।

ব্যাখ্যাঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আট (৮) বৎসর বয়সে রাসলীলার আনন্দ উপভোগের পর কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের মহাপ্লাবন ঘটে। গোপীরা বিরহে ব্যকুলিত হইয়া রাত্রিদিন ক্রন্দন করিতেন। এমনি করিয়া বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে উদ্ধব গোকুলে কৃষ্ণের বার্তা নিয়া গেলেন। উদ্ধবের চেহারা কৃষ্ণের মতো, দেখতে একই রকম মিল। তখন গোপীরা তাঁহাকে এক নিরালা স্থানে বসিতে দিল। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে শুরু করিল। এমন সময় একটি ভ্রমর রাধারাণীর পায়ের উপর আসিয়া বসিল। তখন রাধারাণী ভ্রমরের সঙ্গে কথা বলিতে শুরু করিল। কথা বলিতে বলিতে রাধারাণী উন্মাদের মতো প্রলাপ করিতে লাগিল। শ্রীরাধার প্রলাপ যেন ভ্রমর-গীতাতে—

হে ভ্রমর, কৃষ্ণ এখন মথুরায় তাঁর বান্ধবীদের তোষামোদ করতে ব্যস্ত। কৃষ্ণ আর আমাদের তাঁর অধরসুধা দান করে না; সে ঠিক তোমারই মতো একটি ভ্রমরের আচরণ করে। সে একটি ফুলে বসে একটি মধু পান করেই উড়ে পালিয়ে গিয়ে আর একটি ফুলে বসে। হে দূত, নির্বোধ পক্ষীগণ-কৃষ্ণসারবধূ হরিণীগণ যেমন ব্যাধের মধুর বাদ্য-সংগীত শুনে সরলভাবে তা বিশ্বাস করে এবং তারপরে হৃদয়ে বাণবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে, তেমনই আমরাও কুটিল কৃষ্ণের মধুর কথায় বিশ্বাস ক'রে গভীর বেদনা ভোগ করেছি। ব্রজাঙ্গনাদের ভুলে আর্যপুত্র কৃষ্ণ গুরুকুল হতে প্রত্যাবৃত হয়ে বর্তমানে মধুপুরীতে সুখে বাস করছে। তাঁর পালক পিতা নন্দ মহারাজ, স্নেহময়ী মা যশোদা, তাঁর গোপসখা ও অভাগিণী গোপীসখীবৃন্দ আমাদের কথা কি তাঁর কখনো মনে পড়ে না? সে কি কখনো আমাদের ক্ষমা করবে এবং অগুরুর গন্ধে সুগন্ধিত তাঁর হস্ত দিয়ে আমাদের মস্তক স্পর্শ করবে? দয়া ক'রে তুমি কৃষ্ণের কাছে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র। (চৈ.চ.অ.লী. তাৎপর্যে লিপিবদ্ধ)

উদ্ধবের আগমনে ব্রজে ব্রজবালা।
কৃষ্ণ কথা গাহি' কাঁদি' ত্যাজে অশ্রুমালা।।
সেইকালে গোপী এক ভৃঙ্গে লক্ষ করি'।
উদ্ধবেরে 'দূত-জ্ঞানে বলে প্রিয় স্মরি'।।
মানিনীর প্রসন্নতা সংগ্রহে মাধব।
ব্যস্ত আছে সেই কার্যে মাথুর-বান্ধব।।
ব্রজজনে যাঁর কভু নাই প্রয়োজন।
গোপীতুষ্টি তরে তাঁর নাহিক কারণ।।
সদ্য ত্যাগ করি' হরি' গোপীকার মন।
যেরূপ তোমার মত অর্বাচীন জন।।
সুকুসুম ত্যাগ করি' যায় অন্য-মনে।
তদ্রূপ কৃষ্ণের কার্য আমাদের সনে।।
কৃষ্ণ-পূর্বজন্ম কথা যবে উঠে মনে।
ওহে ভৃঙ্গ, ভয় হয় গোপীকার গণে।।
রাম-অবতারে যবে ব্যাধবৎ হরি।
অবিচারে ক্রুর হই' বালি বধ করি।।
ওহে দূত, মূঢ় পক্ষী ব্যাধের সংগীতে।
যেরূপ বিশ্বাস করি' বাণ-বিদ্ধ-চিতে।।
ক্লেশ ভোগ করে যথা, আমরা তেমন।
কৃষ্ণ কথা বিশ্বাসিয়া পেয়েছি বেদন।।
'সৌম্য' সম্ভোধিয়া বলে গোপী হর্ষভরে।
গুরুকুল হ'তে এবে মথুরা নগরে।।
সুখে বসে আর্যপুত্র, ভুলি' ব্রজাঙ্গনা।
পিতার আবাস-কথা মনে কি পড়ে না?

কিঙ্করী ছিলাম মোরা, আমাদের কথা।
মুখে আনে কভু কিবা ভুলিয়া সর্বথা?
ক্ষেমাস্পদ মোরে জানি' কবে পরশিবে?
অগুরু সুগন্ধি কর গোপীশিরে দিবে?
(ভাগবতমে ১০-৪৭ অধ্যায়ে ভ্রমর সঙ্গীত দেখ) (আরো সাধ্য-সাধনগ্রন্থে মাথুর অধ্যায় দেখ)

প্রশ্ন-৩৫।শ্রীমদ্ভাগবতমের শ্লোকে আছে—

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্।।
(ভা. ১০-৪৭-৬৮)
কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ।।
(ভা. ১০-৪৭-৬৯)

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া উদ্ধবজী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপীগণের বিরহভাবের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

ব্যাখ্যাঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা ও গোপীগণের বিরহজনিত শোক নিবারণ করার জন্য তাঁর সংবাদ নিয়ে একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু উদ্ধবকে ব্রজে গমন করতে বললেন। উদ্ধব গমন করিয়া কৃষ্ণের বার্তা পিতা-মাতা ও গোপীদেরকের পৌঁছে দিলেন। তিনি গোপীদের দর্শন করলেন। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে উদ্ধব প্রায় কৃষ্ণোমত্ত রাধারাণীকে ভ্রমরের সঙ্গে বিরহের কথা বলতে দেখলেন।
কিছুদিন ব্রজে বসবাস করিবার পর উদ্ধব মা যশোদা ও নন্দ মহারাজের কাছে বিদায় লওয়ার অনুমতি চাইলেন। তারপর গোপীদের বিদায় সংবর্ধনা লাভ করিয়া, তাঁহাদের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করিয়া, উদ্ধব তাঁর রথে আরোহন করিয়া মথুরার উদ্দেশ্য যাত্রা করিলেন।

উদ্ধব কৃষ্ণকে কহিলেন—রাধা তোমার বিরহোদ্‌ভ্রমে প্রমথিত হইয়া কখনো কুঞ্জ গৃহে বাসক সজ্জা রচনা করিতেছেন, কখনো বা খণ্ডিতা হইয়া নীল মেঘকে তর্জন করেন, কখনো বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন, কোন্ দশাই বা প্রাপ্ত না হইতেছেন? কৃষ্ণের মথুরা গমনে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে রাধার দশদশা— (চৈ.চ.অ.লী. তাৎপর্যে লিপিবদ্ধ)
(চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু)

উদ্ধব ফিরিয়া যবে কৃষ্ণ-সন্নিধানে।
রাধিকা-বিশাখা-বার্তা-কৃষ্ণ তার স্থানে।।
জিজ্ঞাসিল, তদুত্তরে উদ্ধব কহিল।
মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র সাগ্রহে শুনিল।।
যদুপতে, কি বলিব সেই সব কথা।
তোমার বিরহে রাধা পায় যে যে ব্যাথা।।

তোমার বিচ্ছেদে রাধার দশদশা দর্শন করিলাম।

অক্রূরের অনুরোধে নন্দ গৃহ হইতে।
গোপী হৃদানন্দ যবে গেল মথুরাতে।।
নিজের বিনাশ-চিন্তা-ব্যাকুলতা-ফলে।
ডুবিল অতলস্পর্শ-চিন্তানদী-তলে।।
আমার সন্ধান লাগি' প্রিয়তম কৃষ্ণ।
ভাবিকালে ব্রজে আসি' হইয়া সতৃষ্ণ।।
প্রিয়তম-দরশন স্বপনের কালে।
যে নারীর ঘটে, তার ধন্য লিখে ভালে।।
কৃষ্ণের গমন হ'লে নিদ্রা-রূপা অরি।
ছাড়িয়াছে মম সঙ্গ সাধিতেছে বৈরী।।
ললিতাকে কহে রাধা,—সুমুখি ললিতে।
দহিছে হৃদয় মম, না পারি বলিতে।।
উপদেশ দাও মোরে—কিবা আমি করি।
ক্ষণেকের তরে কিছু ধৈর্য কিসে ধরি।।

আহার-অভাবে বক্ষশ্চ কোরিকাদ্বয়।
গ্লাণিযুক্ত দেখিয়াছি, শুন রসময়।।
নিদাঘে সলিল যেন শুকাইয়া যায়।
তোমার বিরহতাপে রাধা ক্ষীণকায়।।
বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক বিরহ-কাতরা।
হিমপুঞ্জশীর্ণ-পদ্মতুল্য-বিম্বাধরা।।
বিরহ-বিপত্তিবশে বিশাখা সুদীনা।
শারদীয়-রবিতপ্ত-কুমুদনয়না।।
প্রোষিতভর্তৃকা রাধা বিলাপ-কাতর।
বলে—সখী, কোথা নন্দকুলশশধর।।
মম প্রাণরক্ষৌষধিনিধি কোথা, বল।
ধিগ্ বিধি, ভাগ্যে লিখেছিলে এই ফল?
বিরহিনী রাধা কহে—শুন গো ললিতে।
কৃষ্ণের বিরহ-জ্বর না পারি সহিতে।।
গৃহমধ্যে ভ্রাম্যমানা প্রশ্ন যারে তারে।
সচেতন-অচেতনে কিছু না বিচারে।।
বিষম বিরহ-খেদে বিধুরা রাধিকা।
বিভ্রান্তের বশে এবে লুঠিছে মৃত্তিকা।।
ললিতা কৃষ্ণের স্থানে লিখিল পত্রিকা।
তব সুবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা লভিয়া রাধিকা।।
বলে বাস্প-তরঙ্গের স্তম্ভন করিয়া।
রাধা আছেন তব গুরুচিন্তা লইয়া।।
মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণে তিরস্কার করি’।
হংসদ্বারে কহে দেবী ললিতা-সুন্দরী।।
রাসক্রীড়া-রসময়, রসের কারণে।
বেঁধেছিলে রাধিকারে প্রণয়বন্ধনে।।
মম প্রিয় সখী-প্রতি নিরপেক্ষ কেন।
রাধিকা এসব কথা সদা স্মরে যেন।।
নাসারন্ধ্রে তুলা-খণ্ড পরীক্ষা করিব।
শ্বাস বহিলেই ধিক্ তাহাকে জানিব।।
(ভাগবতমের ১০-৪৬ অধ্যায়ে উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন দেখ, আরো দেখ ১০-৪৬ অধ্যায়ে)
(আরো সাধ্য-সাধন গ্রন্থে মাথুর অধ্যায় দেখ)

প্রশ্ন-৩৬। শ্রীমদ্ভাগবতমে লিখিত এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্তসেবয়া।।
(ভাঃ ১০-৮৪-১২)
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।
(ভাঃ ১০-৮৪-১৩)

বাখ্যাঃ অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতারা, তাদের ভেদবুদ্ধিকারী উপাসকদের পাপসমূহ দূর করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তদের প্রতি মুহূর্তের সশ্রদ্ধ সেবাও কারোর পাপ বিনাশ করে।

যে বাক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা ব’লে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন ব’লে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য ব’লে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ ব’লে মনে ক’রে তাতে স্নান করে অথচ তীর্থবাসী অভিজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।

বর্তমান যুগে মাটি, জল, বায়ু, কফ দ্বারা সৃষ্ট মনুষ্যজীবকে গোজামিল দিয়া ভগবানের অবতার তৈরী ক'রে পূজা করে এবং প্রচার করে আরো যেসকল মানুষ, তাদের বুদ্ধি গাধার মতো। কলিযুগের প্রথমে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাবতাররূপে নদীয়া জেলায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' প্রচার করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন—'আমি এই যুগে দুই অবতাররূপে অর্থাৎ নামরূপে জিহ্বাতে ও অর্চ্চাবিগ্রহরূপে বেদীতে কলিযুগের শেষপর্যন্ত কীর্তিত ও পূজিত হইব'। তিনি শচীমাতাকে ইহা বলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে নিম্নের শ্লোকগুলিতে লেখা আছে।

তবে তুমি মথুরায় 'দেবকী' হইলা ।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ।।
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী ।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি ।।
আরও দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে ।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ।।
'মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী ।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী ।।
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে ।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ।।
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা ।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা ।।
(চৈঃভাঃমঃখঃঅ-২৭, শ্লোক-৪৫-৫০)

তারপর কলিযুগের শেষে ৪,৩২,০০০ বৎসর পর কল্কী অবতাররূপে আবার ভগবান আবির্ভূত হবেন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে হাড়-মাংস-রক্ত-কফ দ্বারা সৃষ্ট মনুষ্যজীব, যাঁদের বারবার জন্ম-মৃত্যু হয়, তাঁরা
কেহ ভগবানের অবতার নন। যেসকল ব্যাক্তিগণ তাঁদের পূজা করে, সেই সকল ব্যাক্তিদের বুদ্ধি গাধার মতো।

(ভাগবতমে আরো ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ চৈ.চ.ম.লী-১,৯-১৯৪, চৈ.চ.ম.লী.২, ১৭-১৮৫ দেখ।)

প্রশ্ন-৩৭। শ্রীমদ্ভাগবতমের এই শ্লোকগুলিতে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভক্তের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার বিবরণ লিখ।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।
(ভাঃ ১১-২-৪৫)

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।
(ভাঃ ১১-২-৪৬)

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।
(ভাঃ ১১-২-৪৭)

ব্যাখ্যাঃ অতি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই সকল আত্মার পরম আত্মাস্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান দর্শন করতে পারেন। তার ফলে, তিনি সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কযুক্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, যা কিছু বর্তমান, সবই শ্রীভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে। যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনো তার দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।

কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু, যিনি কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি কার্যেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, বিশেষত অন্যান্য বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁরা ভগবানের বাণী প্রচার ক'রে থাকেন তাঁদের মর্যাদা প্রদান করেন না, তেমন কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু সেই শ্রেণীর মানুষদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবেন, যারা শুষ্ক জ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়ে থাকে।

যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন ক'রে থাকেন, সকল ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিদ্বেষী সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে। যদিও মধ্যম অধিকারী ভক্ত নির্দোষ বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবৎ কথা প্রচার ক'রে আগ্রহবোধ ক'রে থাকে, তবুও তাঁর পক্ষে নিরীশ্বরবাদী মানুষদের উপেক্ষা করাই উচিত, যাতে তাদের সঙ্গদোষে শুদ্ধ ভক্ত বিরক্ত বা দূষিত না হয়ে পড়ে।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চা বিগ্রহের পূজা ক'রে থাকে, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান যে বাস্তবিকই সর্বব্যাপী, তা সে অবহিত নয়। এই ধরণেরই মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়, সেখানে মানুষ তাদের ঘরে-বাড়ীতে এবং পথে ঘাটে যত রকমের পাপকার্য সম্পন্ন করতে থাকে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ গী. ৪/৮,১১,৬/৩০,১৩/২৩)

প্রশ্ন-৩৮। শ্রীমদ্ভাগবতমে লিখিত এই শ্লোকগুলিতে চারিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব ও গাত্রবর্ণ বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা একটি paragraph এর মধ্যে লিখ।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।
(ভাঃ ১০-৮-১৩)

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ।।
(ভাঃ ১১-৫-২১)

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।
(ভাঃ ১১-৫-২৪)

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নীজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।।
(ভাঃ ১১-৫-২৭)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।।
(ভাঃ ১১-৫-৩২)

ব্যাখ্যাঃ তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ ক'রে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ ক'রে প্রকট হয়েছেন [অন্য দ্বাপর যুগে ইনি (শ্রীরামচন্দ্র রূপে) শুকপক্ষীর মতো বর্ণ ধারণ ক'রে আবির্ভূত হন। এই সমস্ত অবতারেরা এখন শ্রীকৃষ্ণতে সমবেত হয়েছেন।]

গর্গমুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি আংশিকভাবে গোপন রেখে এবং আংশিকভাবে ব্যক্ত ক'রে বলেছেন, 'তোমার পুত্র একজন মহাপুরুষ এবং তিনি বিভিন্ন যুগে তাঁর দেহের রং পরিবর্তন করতে পারেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই প্রত্যেক যুগে ভগবান শ্রীকেশব নানাবর্ণে, নামে এবং আকারে আবির্ভুত হন এবং সেইভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় আরাধ্য হয়ে থাকেন।

ত্রেতা যুগে শ্রীভগবান রক্ত দেহবর্ণে আবির্ভূত হন। তাঁর চতুর্ভুজ, স্বর্ণবর্ণ কেশরাজি থাকে এবং তিনটি বেদ শাস্ত্রের প্রত্যেকটিতে দীক্ষিত হওয়ার লক্ষণস্বরূপ তিনটি মেখলা পরিধান করেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের উপাসনা সম্বলিত ঋক, সাম ও যজুঃ যে বেদ শাত্রগুলির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞ উপকরণাদি রূপে স্রুক্, স্রুব এবং অন্যান্য সামগ্রী তিনি ধারণ ক'রে থাকেন।

দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান পীত বস্ত্র ধারণ ক'রে শ্যাম বর্ণে অবতরণ করেন। এই অবতরণে ভগবানের দেহ শ্রীবৎস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমূলক অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহের প্রকাশ ঘটান।

কলিযুগে যে সব বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে সংকীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের নাম গানের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা ক'রে থাকেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণ বর্ণ নয়, তাহলেও তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে রয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা, সেবকগণ, অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ চৈ.চ.আ.লী.৩-৩৯,৫১,৫২, চৈ.চ.আ.লী.৭-৪, চৈ.চ.আ.লী.১৪-৫১,৫৫)

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ চৈ.চ.ম.লী.১,৩-২০৩, চৈ.চ.ম.লী.১, ৬-১০২,১০৩, চৈ.চ.ম.লী.-২,২০-২৪৫,২৪৬)

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ গীতা- ৩/১০)

প্রশ্ন-৩৯। শ্রীগুরুদেবকে সাধারণ মানুষ মনে করা এবং অবজ্ঞা করা অপরাধ। শ্রীমদ্ভাগবতমের এই শ্লোকটিতে যাহা বলা হইয়াছে, ইহার ব্যাখ্যা লিখ।

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ।।
(ভাঃ ১১-১৭-২৭)

ব্যাখ্যাঃ আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনো কোনোভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে ক'রে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ।

উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটির উল্লেখ করেন। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারীর কিভাবে আচরণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুদেব কখনো তাঁর শিষ্যের সেবা উপভোগ করেন না। তিনি ঠিক একজন পিতার মতো। পিতার স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিশু যেমন বড় হতে পারে না, ঠিক তেমনই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান ব্যতীতও শিষ্য ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে না।
মনুসংহিতায় (২/১৪০) আচার্যের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে বলা হয়েছে যে, তিনি শিষ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপূর্বক শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং এইভাবে তাকে দ্বিতীয় জন্মদান করেন।
কেউ যদি ভগবানের সেবা না ক'রে নিজেকে আচার্য বলে জাহির করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে অপরাধী এবং তার আচার্য হওয়ার যোগ্যতা নেই। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলে জেনে সর্বদা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, গুরু বা আচার্য কখনো শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের অনুকরণ করেন না। ভণ্ড গুরুরা নিজেদের সর্বতোভাবে কৃষ্ণ বলে প্রচার ক'রে শিষ্যদের প্রতারণা করে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ চৈ.চ.আ.লী. ১-৪৬ দেখ)

প্রশ্ন-৪০।শ্রীমদ্ভাগবতমে **১১-৩০** ও **১১-৩১** অধ্যায়ে যদু বংশের এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের বর্ণনা করা হয়েছে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। এই প্রসঙ্গে নিম্নেলিখিত শ্লোকগুলির বাখ্যা লিখ।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্।।
(যোগধারণয়াগ্নেয়+অদগ্ধ্বা) (ভাঃ **১১-৩১-৬**)

'অনন্তর তিনি ধ্যানধারণার বিশুদ্ধ-বিষয়ী-ভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহ আগ্নেয়ী যোগধারণদ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইলেন।'

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।
সত্যং ধর্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্তিঃশ্রীশ্চানু তং যযুঃ।।
(ভাঃ **১১-৩১-৭**)

দেবাদয়োব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ।।
(ভাঃ **১১-৩১-৮**)

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ।।
(ভাঃ **১১-৩১-৯**)

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্টা যোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্ত স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা।।
(ভাঃ **১১-৩১-১০**)

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্।।
(ভাঃ **১১-৩১-২৩**)

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্।।
(ভাঃ **১১-৩১-২৪**)

পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণা-
মন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম।।
(ভাঃ **৯-২৪-৬৭**)

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য কুরুবংশীয়দের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করেছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে সমস্ত আসুরিক রাজাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন এবং অর্জুনের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে তিনি উদ্ধবকে পরতত্ত্ব এবং ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান ক'রে তাঁর স্বরূপে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

আরো ভাঃ **১-১৪** শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান লীলা দেখ।

ব্যাখ্যাঃ সমস্ত উপদেশ লাভ করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো শ্রীউদ্ধব বদ্রিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি পরমেশ্বরের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন ক'রে ভগবানের দিব্য ধামে উপনীত হন। শ্রীউদ্ধবের বদ্রিকাশ্রমে গমনের পর, বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দর্শন ক'রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে দ্বারকা ত্যাগ ক'রে প্রভাসে যেতে আদেশ করেন। তাঁরা কৃষ্ণের আদেশ পালন করতে প্রভাসে গমন করেন। ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে যদুবংশের যোদ্ধাগণ ভয়ানক ক্রোধে নিজেরা নিজেদের হত্যা করেছিলেন। বলরাম সমুদ্রতটে উপবেশন ক'রে নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন ক'রে এই মরজগৎ পরিত্যাগ করেন। ভগবান রামের অন্তর্ধান দর্শন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ একটি অশ্বথ বৃক্ষের তলে বামচরণ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন ক'রে ভুমিতে উপবেশন করেন। ভগবানের শ্রীচরণকে হরিণের মুখ মনে ক'রে জরা নামক এক ব্যাধ দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে। বাস্তবে, ঐ তীরটি ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছিল মাত্র, বিদ্ধ হয়নি, কেননা ভগবানের অঙ্গসকল সচ্চিদানন্দময়। তারপর, জরা ভগবানকে দর্শন ক'রে ভীত হ'য়ে ভগবানের চরণে পতিত হয়। জরা বলল আমি একজন পাপিষ্ঠ ব্যাক্তি, অজ্ঞানতাবশতঃ এই কার্য করেছি। অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন। এই পাপিষ্ঠ ব্যাধকে হত্যা করুন যাতে সে পুনরায় সাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইরূপ অপরাধ না করে। পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় জরা, ভয় পেয়ো না। তুমি ওঠো । যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমারই অভিপ্রায়। আমার অনুমতিক্রমে তুমি এখন বৈকুণ্ঠে গমন কর। সেই শিকারি ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে, কৃষ্ণকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করে। তারপর তার জন্য আগত বিমানে আরোহণ ক'রে শিকারি বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করল। সেই সময় দারুক অশ্বথমূলে ভগবানকে দর্শন ক'রে অশ্রুপূর্ণ নয়নে রথ থেকে অবতরণ ক'রে ভগবানের চরণে পতিত হ'ল। তখন ভগবান বললেন—তুমি দ্বারকায় গমন ক'রে বর্তমান অবস্থা বলবে। দারুক, তোমার জড় বিচারের প্রতি অনাসক্ত হওয়া এবং দৃঢ় ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এই সমস্ত অন্তর্ধান লীলাকে আমার মায়াশক্তির প্রদর্শনরূপে জেনে শান্ত থাকা উচিত। দারুক ভগবানকে প্রদক্ষিণ ক'রে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ ক'রে দুঃখিত হৃদয়ে শহরে প্রত্যাবর্তন করেছিলো।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কি না, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উল্লেখ নাই। শ্রীমতী রাধারাণীকে আশ্বাস দিলেও শ্রীকৃষ্ণ আর কোনোদিনও বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি দ্বারকা হইতে স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া গোলকধামে চলিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে ফিরিয়া যাওয়ার পর ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কোনো বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, বিশ্বস্ততা, খ্যাতি এবং সৌন্দর্য অবিলম্বে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। স্বর্গে দুন্দুভি শব্দিত এবং আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ধামে প্রবেশ অধিকাংশ দেবগণ দর্শন করতে পারেননি। শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীমহাদেব আদি কয়েকজন মাত্র ভগবানের অলৌকিক শক্তি কীভাবে কাজ করছে, তা নির্ধারণ করতে পেরে আশ্চর্যন্বিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেবগণ ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা ক'রে তাঁরা নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দারুক শহরে এসে সংবাদ দেয়ার পর রমণীগণসহ সকলে প্রভাসে গমন করেন এবং সেখানে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র দ্বারকা পরিত্যাগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি ব্যতীত সমস্ত দিক সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকায় নিত্য বিরাজমান। সমস্ত মঙ্গলময় স্থানের মধ্যে এটি পরম মঙ্গলময় এবং কেবলমাত্র তাঁর স্মরণ করলে সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়।

(ভাগবতমে আরো ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-৪১। শ্রীমদ্ভাগবতমের ১২-২ অধ্যায়ে কলিযুগের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কলিযুগের দোষগুলির বর্ণনাসহ কল্কি অবতারের কার্যের বিবরণ লিখ।

ব্যাখ্যাঃ হে রাজন, তারপর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, শুচিতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, দৈহিক বল এবং স্মরণশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে। যৌন ব্যভিচার, মাংসাহার, তামাক সেবন, মদ আদি নেশা ইত্যাদি সহজলভ্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের নিয়মিতভাবে ধ্বংস করছে। কলিযুগে 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। বলবান এবং বলহীনদের মধ্যে আইন বিচারে বৈষম্য আরোপিত হবে। শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে বসবাস করবে। বাণিজ্যে সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। রতিক্রিয়ায় দক্ষতা অনুসারে নারীত্ব ও পুরুষত্বের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমে কোনো মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। কলিযুগে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বেষ ধারণের মাধ্যমে কোনো মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবেন। কোনো মানুষের হাতে যদি টাকা না থাকে, তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে। ভণ্ডামিকে গুণ বলে স্বীকৃতি দেয়া হবে। শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র স্নান করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশের ধর্মীয় গোঁড়ারা সাধারণত ধূমপান, মদ্যপান, যৌনতা, জুয়া এবং পশু হত্যা আদি বহু বদ অভ্যাসে আসক্ত। পাপীরাই ধার্মিক রূপে উৎসাহিত হচ্ছে এবং সাধুদেরকে অসুররূপে নিন্দা করা হচ্ছে। এই যুগে বিবাহ ব্যবস্থার অধঃপতন ঘটবে। ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত-জঙ্গলে পলায়ণ করবে। অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক-পাতা, বৃক্ষমূল, মাংস, বন্যমধু, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ খেতে শুরু করবে, খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। কলিযুগে মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু হবে পঞ্চাশ বছর। গাভীগুলি হবে প্রায় ছাগলের মতো। তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনই হবে পারিবারিক বন্ধন। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য ক'রে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন। ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন। জগৎপতি ভগবান কল্কি তাঁর দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে তাঁর অপ্রতিম প্রভা প্রদর্শন ক'রে এবং অতি দ্রুত বেগে ভ্রমণ ক'রে তিনি কোটি কোটি রাজপোষাক পরিহিত দস্যু তস্করদের হত্যা করবেন। কল্কিরূপে ধর্মপতি পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন সত্য যুগের সূচনা হবে এবং মানব সমাজ তখন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম দান করবে।

(ভাগবতমে ব্যাখ্যা দেখ)

প্রশ্ন-৪২।শ্রীমদ্ভাগবতমের এই শ্লোকগুলিতে কলিযুগের মহৎ গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার বিবরণ দাও।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।
(ভাঃ ১২-৩-৫১)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।
(ভাঃ ১২-৩-৫২)

ব্যাখ্যাঃ হে রাজন, যদিও কলিযুগ হচ্ছে এক দোষের সাগর, তবুও তার একটি মহান গুণ আছে—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম ধামে উন্নীত হবেন। কলিযুগের অসংখ্য দোষ বর্ণনা করার পর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন এর একটি উজ্জ্বল গুণের কথা উল্লেখ করছেন। ঠিক যেমন একজন প্রবল পরাক্রমী রাজা অসংখ্য চোরদের হত্যা করতে পারেন, তেমনই একটি উজ্জ্বল পারমার্থিক গুণ এই যুগের সমস্ত কলুষকে ধ্বংস করতে পারে। সত্য যুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান ক'রে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের চরণ পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে। এইভাবে কলিযুগে তপ অনুশীলন, ধ্যানযোগ, বিগ্রহ অর্চন, যজ্ঞ প্রভৃতি এবং এদের বিভিন্ন আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ এমনকি অত্যন্ত পারদর্শী দেহবদ্ধ জীবাত্মার দ্বারাও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হবে না।

সিদ্ধান্তে বলা যায় যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, যার দ্বারা কলিযুগের বিপদ সংকুল সমুদ্র থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করা যেতে পারে, তাঁর জপ ও কীর্তনে বিশ্বজুড়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচার করা উচিত।

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রান্ত, ঠিক তেমনি সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

হে দেবেশ, হে নাথ, অনুগ্রহপূর্বক জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার চরণকমলে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা করার অধিকার দান করুন।

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি যাঁর নাম সংকীর্তন সর্বপাপ বিনাশ করে এবং যাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত জড় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়। আমরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের চরণকমলে আমাদের পরম সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁরই কৃপাতে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণকে, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর নিত্য পার্ষদগণকে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে এবং পরম দিব্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

(ভাগবতমের ব্যাখ্যা দেখ) (আরো ব্যাখ্যা দেখ ১২-১৩-১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ শ্লোকগুলি)

Total teaching hours-480 (570-600 periods) Total questions-78 Total marks-600

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীঃ—এমন সময় আসবে যখন বিশ্বের লোকেরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়ার জন্যই বাংলা ভাষা শিখবে। চৈ. চ. আদিলীলা, প্রকাশকের নিবেদন, পৃঃ- ছ)

প্রশ্ন-১। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আ.লী.-১প.১-২ শ্লোকে শিক্ষা ও দীক্ষাভেদে গুরুবর্গের এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ।।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।

ব্যাখ্যাঃ আমি শিক্ষা ও দীক্ষা ভেদে গুরুবর্গের, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের (শ্রীবাস আদি), পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণের (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আদি), পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশসমূহের (শ্রীনিত্যানন্দ আদি), পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিসমূহের (শ্রীগদাধর আদি) এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করি। গৌড়দেশে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, তাই ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিক্যপ্রসূত নতুন কোনো কিছু থাকবে না। তিনি বদ্ধ জীবের অগোচর অপ্রাকৃত তত্ত্ব। এই গ্রন্থে মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার কোনো স্থান নেই, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে বাস্তব চিন্ময় অভিজ্ঞতা, যা পূর্বোক্ত গুরু-পরম্পরার ধারা স্বীকার করলেই কেবল হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এটি পূর্বতন আচার্যদের আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে তাঁদের সেবা করার এক বিনীত প্রচেষ্টা।

প্রশ্ন-২। চৈ.চ.আ.লী.১প. ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপ্রাকৃত তত্ত্বের উল্লেখ কর।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম প্রকাশকে শ্রীগুরুদেবরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু রূপে আবির্ভূত হন। তারপর ভগবদ্ভক্তের এবং ভগবানের অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। অবতারদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—অংশ-অবতার, গুণ-অবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতার। তারপর ভগবানের শক্তির আলোচনা করা হয়েছে। ভগবানের এই শক্তি (লীলাসঙ্গিনী) তিন প্রকার—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং সর্বোত্তম ব্রজধামের গোপিকারা। এই সকল শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী হইতে প্রকাশিত। চরমে হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এই সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস অর্থাৎ তিনিই শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান মূলত এক হলেও, তাদের কার্যকলাপ ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়, যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। এভাবেই পরমতত্ত্ব একই তত্ত্বে বৈচিত্ররূপে প্রকাশিত হন। বেদান্তসূত্র অনুসারে এই দার্শনিক তত্ত্বকে বলা হয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব বা যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন তত্ত্ব।

প্রশ্ন-৩। চৈ.চ.আ.লী. ১প.৩-৪-৫-৬ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা লিখ।

ব্যাখ্যাঃ উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ-বৈভব। তত্ত্ব বিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্নস্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।

পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত যা অর্পিত হয়নি এবং উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তি সম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফূরিত হোন।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা, সুতরাং শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এই জন্য শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ এক আত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলকে পৃথক দেহ ধারণ ক'রে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

প্রশ্ন-৪। চৈ.চ.আ.লী. ১প. ১৫-১৬-১৭ শ্লোক তিনটিতে বৃন্দাবনের তিন মূখ্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেব ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথজীর বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

ব্যাখ্যাঃ আমি পঙ্গু ও মন্দমতি যাঁরা একমাত্র আমার পতি যাঁদের পাদপদ্ম আমার সর্বস্ব ধন, সেই পরম কৃপালু রাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের অরণ্যে কল্পবৃক্ষতলে রত্ন-মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ (সখীগণ) কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি তাঁদের স্মরণ করি।

রাসনৃত্য রসের প্রবর্তক বংশীবট-তটস্থিত পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। এই তিন ঠাকুরের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী রয়েছে। পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীমদনমোহনের আরাধনা করা, যাতে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে মুক্ত ক'রে আমাদের আকর্ষণ করেন। কেউ যখন গভীর আসক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করার বাসনা করেন, তখন তিনি অপ্রাকৃত সেবার স্তরে শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা করেন। গোবিন্দ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তদের কৃপায় কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি ব্রজাঙ্গনাদের আনন্দ বিগ্রহ গোপীনাথ রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন।

প্রশ্ন-৫। চৈ.চ.আ.লী. ১প. ১০৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখ।

"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" ইতি।।

ব্যাখ্যাঃ মূল সত্য (মূল প্রয়োজন অর্থাৎ কুঞ্জলীলায় প্রবেশ) যদি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়, তাহলে তাঁকেই যথার্থ বাগ্মিতা বলা হয়। এই শ্লোকটি অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনের স্বশাস্ত্রের উক্তি। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতম্ অত্যন্ত বিশাল ও কঠিন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চস্তরের ভক্তই ইহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। আমদের মতো মূর্খ ও সাধারণ মানুষ তাহা বুঝতে পারে না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ অত্যন্ত সহজ-সরল ও মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাহা অবোধ মানুষ সহজে বুঝতে পারে, যে কিছুই বোঝে না সেও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভূত মাধুর্যরসের লীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই বড় হয় হিত।। (চৈ.চ.ম.লী.২-৮৭)

প্রথমে কেউ যদি তা বুঝতে নাও পারে, কিন্তু বারবার শোনার ফলে তার হৃদয়েও কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হবে। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রভাব যে, ধীরে ধীরে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম তখন হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বারবার এই গ্রন্থ শ্রবণ করার জন্য, যার প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান।। (চৈ.চ.আ.লী.৭-২৩)
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে।। (চৈ.চ.আ.লী.৯-৩৬)
গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।। (চৈ.চ.ম.লী.১, ৮-২৩০)

সুতরাং, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ-আলোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে, শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া অধিকার নাই। যারা বলেন—'অন্য কারোর অধিকার নাই, একমাত্র আমাদেরই (নিজেদের) অধিকার, তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়'। গুরুবর্গের ভবিষ্যদ্বাণী—'এমন সময় আসবে যখন বিশ্বের লোকেরা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়ার জন্যই বাংলা ভাষা শিখবে।'

প্রশ্ন-৬। চৈ.চ.আ.লী. ২প. শ্লোক-১ এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোহপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ।।

ব্যাখ্যাঃ আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। বর্তমানে দেখা যায় অনেক অপসম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। তাদের দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করার ফলে বিভিন্ন প্রকার মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই সকল মতবাদ ভয়ঙ্কর কুমীর ছাড়া আর কিছুই নয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে অজ্ঞান এবং অনভিজ্ঞ শিশুও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদরূপী ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণীসঙ্কুল অজ্ঞানের সমুদ্র অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। বৌদ্ধ-দর্শন, তার্কিকদের জ্ঞানপদ্ধতি, পতঞ্জলি ও গৌতমের যোগপদ্ধতি এবং কণাদ, কপিল, দত্তাত্রেয় আদি দার্শনিকদের মতবাদগুলি হচ্ছে অজ্ঞান-সমুদ্রের ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীসমূহ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই সমস্ত সংকীর্ণ মতবাদের প্রভাব অতিক্রম ক'রে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই,
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাতিগোঁসাই।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী,
তোতা বলে এই তেঁরোর সঙ্গ নাহি করি।।

এই সকল অপসম্প্রদায় ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের প্রভাবে মনুষ্য সমাজে কলুষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বহু তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলি যথাযথভাবে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না, তাই তাদের বলা হয় অপসম্প্রদায়, যার অর্থ হচ্ছে 'সম্প্রদায় বহির্ভূত'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতে হলে, এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের সঙ্গ করা উচিত নয়।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়।। (চৈ.চ.ম.লী.১, ২-৪৩)

শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম ঠিক জাম্বুনদের সোনার মতো এবং সেই প্রেম নৃলোকে অনুপস্থিত। যদি তা দেখা যায়ও, তবে কখনো বিচ্ছেদ হয় না। যদি বিচ্ছেদ হয়, তবে জীবন থাকে না।

কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মশীবিন্দু।। (চৈ.চ.ম.লী. ২-৪৮)

"কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত নির্মল, ঠিক গঙ্গাজলের মতো। সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু। সেই নির্মল অনুরাগে অন্য কোনো দাগ লুকোতে পারে না। সাদা কাপড়ে যেমন কালির দাগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, ঠিক তেমনই বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে ভগবানের প্রতি অনুরাগের অভাব অত্যন্ত প্রবলভাবে ফুটে উঠে।"

কৃষ্ণ প্রেমাই সাধ্য এবং কৃষ্ণনামসংকীর্তনই সাধন। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন-৭। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ২য় পরিচ্ছেদের ৬,৯,১০ শ্লোকগুলি লিখ ও ব্যাখ্যা দাও।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন।।
'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি।।
প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং-ভগবান্।।

ব্যাখ্যাঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি (অপ্রাকৃত আলো) হচ্ছে সবিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। শ্রী গৌর সুন্দর বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর চিন্ময় দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। তেমনই, অন্তর্যামী পরমাত্মা ক্ষীরোদকশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে, কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আংশিক প্রকাশিত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বৈভব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছুই নেই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্বের তিনটি উদ্দেশ্য বা অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ-প্রকাশ ও স্বরূপ হচ্ছে যথাক্রমে এই তিন উদ্দেশ্যের বিধেয়। নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীচৈতন্য (মহাপ্রভু) গোঁসাইরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে পরিচিত হন।

প্রশ্ন-৮। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ২য় পরিচ্ছেদের ৮৩,৮৪,৮৫,৮৬,৮৯ শ্লোকগুলি লিখ ও ব্যাখ্যা দাও।

কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য।।
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন।।
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান।।
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্য-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব।।

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।।

ব্যাখ্যাঃ তার ফলে প্রতিপন্ন হল যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যে অন্য আর কেউ স্বয়ং ভগবান নন, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল। শ্রীকৃষ্ণ যদি অংশ হতেন এবং নারায়ণ যদি হতেন তাঁর অংশী, তা হলে শ্রীল সূত গোস্বামীর উক্তিটি বিপরীত হত। তা হলে তিনি বলতেন, সমস্ত অবতারের উৎস নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্যে ভ্রম (ভুল করার প্রবণতা), প্রমাদ (মোহগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা), বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করার প্রবণতা) ও করণাপাটব (ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি) জনিত কোনো দোষ বা ত্রুটি থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ যদি নারায়ণের অংশ-প্রকাশ হতেন, তা হলে মূল শ্লোকটি ভিন্নরূপে রচিত হত; তা হলে অবশ্যই তা বিপরীতভাবে বর্ণিত হত। কিন্তু নিত্যমুক্ত ঋষিদের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব জনিত কোনো দোষ থাকতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, এই বর্ণনায় কোনো ভুল নেই। শ্রীল ব্যাসদেবের মতো নিত্যমুক্ত ঋষির রচনায় কোনো ভুল থাকতে পারে না। একটি দীপ থেকে যখন অন্যান্য বহু দীপ প্রজ্বলিত হয়, তখন প্রজ্বলনকারী সেই দীপটিকেই মূল দীপ বলে বিবেচনা করা হয়। একটি প্রজ্বলিত দীপ থেকে আরও অনেক দীপকে জ্বালানো যেতে পারে, প্রজ্বলনকারী প্রথম দীপটিকেই মূল দীপ ব'লে গণনা করা হয়।

প্রশ্ন-৯। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৩য় পরিচ্ছেদের ১২,১৩,১৪,২৬,২৯-এ গৌর অবতাররূপে আবির্ভাবের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ শ্লোকগুলি লিখ।

দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা।।
যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি' মনে করে অনুমান।।
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।।
যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।।
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়।।

ব্যাখ্যাঃ এই দিব্যপ্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে তাঁর দাস, সখা, পিতা-মাতা ও প্রেয়সীদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন। তাঁর ইচ্ছাক্রমে পর্যাপ্তভাবে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস উপভোগ করার পর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন। অন্তর্ধানের পর তিনি মনে মনে অনুমান করেন। বহুকাল পর্যন্ত আমি জগতের মানুষকে আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি দান করিনি। ভক্তি বিনা জগতের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আমার অংশ-প্রকাশেরাও প্রত্যেক যুগে অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারে। কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কেউ ব্রজের প্রেম দান করতে পারে না। এভাবেই চিন্তা ক'রে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম ভাগে (সন্ধ্যায়) নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন।

চারি যুগে চারি প্রকার সাধন পদ্ধতি—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যাগ-যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা ও অর্চনা, কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করিয়া কুঞ্জলীলায় অর্থাৎ কুঞ্জসেবায় প্রবেশ।

প্রশ্ন-১০। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৩য় পরিচ্ছেদের ৯২,৯৩, ১০৩,১০৪,১০৮,১০৯ শ্লোকগুলি অর্থ লিখ।

আচার্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার।।
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার।।
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে।।
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।
গঙ্গাজল, তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ।।
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন ভক্তরূপে ভগবানের অবতার। তাঁর উচ্চ হুঙ্কারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। কোন্ আরাধনা করার মাধ্যমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বশ করতে পারবেন? এভাবেই তিনি যখন ভাবতে লাগলেন, তখন তাঁর একটি শ্লোক মনে পড়ল। "যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি তুলসীপত্র এবং এক অঞ্জলি জল নিবেদন করেন, ভক্তবৎসল ভগবান সম্পূর্ণরূপে সেই ভক্তের বশীভূত হয়ে পড়েন" (মূল শ্লোকটি গৌতমীয়তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত)। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্মরণ ক'রে তিনি প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল অর্পণ করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই জগতে অবতরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি হুঙ্কার করতেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভগবান এই ধরাধামে অবতরণ করেছিলেন। ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রে ভগবান আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন প্রথমে তিনি তাঁর গুরুবর্গকে অবতরণ করান।

প্রশ্ন-১১। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৬,৭,১০,১৫,১৬ শ্লোকগুলি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ।।
পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে।।
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে।।
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম।।

ব্যাখ্যাঃ ভগবানের দিব্য নামের কীর্তন এবং ভগবৎ প্রেম প্রচার করার জন্যই তাঁর এই আগমন। যদিও সেই কথা সত্য, তবে এগুলি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের আর একটি নিগূঢ় (অন্তরঙ্গ) কারণ রয়েছে, অনুগ্রহ ক'রে সেটি শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পূর্বে পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন ভগবানের অন্য সমস্ত অবতারেরাও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। দুটি কারণে ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করেন—ভগবৎ-প্রেমরসের নির্যাস আস্বাদন করা এবং এই জগতে রাগমার্গ বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের স্তরে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা। তাই তিনি রসিক-শেখর এবং পরম করুণ নামে পরিচিত। তাঁর মাধুর্য প্রেমে লীলাবিলাস প্রদর্শনের মাধ্যমে বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় কুঞ্জলীলায় অর্থাৎ কুঞ্জসেবায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন।

প্রশ্ন-১২। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ১৭,১৮,১৯,২১,২২,২৪,২৫,২৬ শ্লোকগুলি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।।
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে।।
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি।।
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।।
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন।।
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম।।
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।।

ব্যাখ্যাঃ সমস্ত জগৎ আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে আমার প্রতি সম্ভ্রম-পরায়ণ। কিন্তু এই ঐশ্বর্যপ্রসূত সম্ভ্রমের প্রভাবে প্রেম শিথিল হয়ে যায় বলে তা আমাকে আনন্দ দান করে না। কেউ যখন আমাকে ভগবান বলে জেনে নিজেকে হীন বলে মনে করে, তখন আমি তার প্রেমে বশীভূত হই না বা তার অধীন হই না। আমার ভক্ত আমাকে যে যেভাবে ভজনা করে, আমিও সেভাবেই তাকে অনুগ্রহ

করি। সেটিই আমার স্বভাব। কেউ যখন আমাকে তার পুত্র, সখা অথবা প্রেমাস্পদ বলে মনে ক'রে শুদ্ধ ভক্তিযোগে আমার সেবা করে এবং নিজেকে উর্ধ্বতন ও আমাকে তার সমকক্ষ অথবা অধস্তন বলে মনে করে, তখন আমি তার বশীভূত হই। মাতা আমাকে তাঁর পুত্র বলে মনে ক'রে কখনো দড়ি দিয়ে বাঁধেন। আবার আমাকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা ক'রে আমার লালন-পালন করেন। শুদ্ধ সখ্যভাবে আমার সখারা আমার স্কন্ধে আরোহণ ক'রে বলে, 'তুমি কোন্ বড় লোক ? তুমি আর আমি সমান'। আমার প্রিয়া যদি অভিমান ক'রে আমাকে ভর্ৎসনা করে, তবে তা বেদের বন্দনা থেকেও আমার মনকে অধিক আকৃষ্ট করে।

প্রশ্ন-১৩। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ২৯,৩০,৩১ শ্লোকগুলি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।।
আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দুহার রূপগুণে দুহার নিত্য হরে মন।।
ধর্ম ছাড়ি' রাগে দুহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে, —দৈবের ঘটন।।

ব্যাখ্যাঃ যোগমায়ার প্রভাবে গোপিকারা আমাকে তাদের উপপতি বলে মনে করে। গোপিকারা তা জানে না বা আমিও তা জানি না, কেন না আমরা আমাদের পরস্পরের রূপ ও গুণে সর্বদাই মুগ্ধ থাকি। পরস্পরের প্রতি শুদ্ধ অনুরাগের ফলে ধর্ম ত্যাগ করেও আমাদের মিলন হবে। দৈবের প্রভাবে কখনও আমাদের মিলন হবে, আবার কখনও বিচ্ছেদ হবে। ভগবানের যোগমায়া শক্তির প্রভাবে ভগবান আত্মবিস্মৃত হন। এই যোগমায়া শক্তির প্রভাবে ব্রজগোপিকারা মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাদের উপপতি। সেই দিব্য প্রেমের আবেগে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবালারা উভয়েই আত্মবিস্মৃত হন অর্থাৎ জড় রক্ত-মাংস দ্বারা গঠিত স্ত্রী-পুরুষের কাম বাসনার মতো কার্যকলাপ থাকে না। জড়-হাড়-মাংস-পিত্ত-কফ দ্বারা গঠিত শুধুমাত্র স্ত্রী-পুরুষের শরীর দ্বারাই কামের কার্যকলাপ সাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এতই মধুর যে, কৃষ্ণ ও ব্রজগোপীরা অপ্রাকৃত আনন্দে নৃত্য-গীতে গভীরভাবে মগ্ন হন। দৈবের প্রভাবে কখনো মিলন হয়, আবার কখনো বিচ্ছেদ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীকাদের দেহ সৎবস্তু (ব্রহ্মজ্যোতি), চিৎবস্তু (প্রাণময়) ও অপ্রাকৃত আনন্দ দ্বারা গঠিত ঘণীভূত বিগ্রহ। যিনি যথাযথভাবে রাসলীলার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি জড়-জাগতিক যৌন জীবনে কখনো লিপ্ত হন না।

প্রশ্ন-১৪। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪,৫০,৫৬,৫৭ শ্লোকগুলি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্তন।।
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে।।
এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার।।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম, চতুর্বিধ ভক্তই আধার।।
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে।।
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।।
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি'।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি'।।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একটাই।।

ব্যাখ্যাঃ এভাবেই দুটি কারণবশত ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান অবতরণ করেছিলেন এবং নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেমামৃত আস্বাদন করেছিলেন। এভাবেই তিনি এমন কি আচণ্ডালের মধ্যেও কীর্তন প্রচার করেছিলেন। তিনি নাম ও প্রেমের একটি মালা গেঁথে সমস্ত জড় জগতের গলায় পরিয়েছিলেন। এরূপে ভক্তভাব অবলম্বন ক'রে তিনি স্বয়ং সেই ভক্তি আচরণপূর্বক তা প্রচার করেছিলেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের চারটি রস। এই চারটি রসের আধার হচ্ছেন চার প্রকার ভগবদ্ভক্ত। সমস্ত রসের ভক্তরাই তাঁদের নিজের ভাবটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং সেই ভাব অনুসারে তাঁরা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে

যদি এই রসসমূহের বিচার করা হয়, তা হলে দেখা যায় যে, শৃঙ্গার রসের মাধুর্য সব চাইতে বেশি। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীহরি, তিনি রাধারাণীর সেই ভাব অঙ্গীকার ক'রে নিজের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাঁরা দুটি পৃথক দেহ ধারণ করেছেন। এভাবেই তাঁরা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন। রস আস্বাদন করার জন্য এখন তাঁরা দুজন এক দেহ ধারণ ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

প্রশ্ন-১৫। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৫৯-৬০ শ্লোক দু'টি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার।।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ।।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার। তিনি হ্লাদিনী নামক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। সেই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করায় এবং তাঁর ভক্তদের পোষণ করে। ভগবদ্ভক্তিতে আকর্ষণীয় এমন কি আছে, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তা এমনভাবে গ্রহণ করেন? আর এই সেবার ধরনই বা কি রকম? তার উত্তরে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। মায়া বা অজ্ঞান তাঁকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না। অতএব যে শক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে বশ করে তা অবশ্যই পরা শক্তি। সেই শক্তি কখনোই জড়া প্রকৃতিসম্ভূত হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান যে আনন্দ উপভোগ করেন, তা নির্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মানন্দের মতো হেয় আনন্দ নয়। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে দুটি সত্তার মধ্যে প্রেমের বিনিময় এবং তাই তা একক আত্মার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। নির্বিশেষ উপলব্ধির আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ ভগবদ্ভক্তির সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন-১৬। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৭৪,৭৫,৭৬,৭৭,৭৮,৭৯,৮০,৮১,৮২,৮৫ শ্লোকগুলি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর।।
ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার।।
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার।।
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি।।
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশস্বরূপ।।
আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ।।
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ।।
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে।।
গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব, সর্বকান্তা-শিরোমণি।।
কৃষ্ণময়ী-কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।।

ব্যাখ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সহচরীরা তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজগোপিকাগণ। ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণী থেকে এই সমস্ত কান্তাদের বিস্তার হয়েছে। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকে যেভাবে সমস্ত অবতারদের বিস্তার হয়, তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী থেকে সমস্ত লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজদেবীরা প্রকাশিত হন। লক্ষ্মীদেবীরা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ-প্রকাশ এবং মহিষীরা তাঁর মূর্তির প্রতিবিম্ব। লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন তাঁর বৈভব-বিলাসাংশ এবং মহিষীগণ হচ্ছেন তাঁর বৈভব-প্রকাশ। ব্রজদেবীদের আকার ও স্বভাব বিভিন্ন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর কায়ব্যূহ এবং তাঁর রস বিস্তার করেন। বহু কান্তা ব্যতীত রস আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। তাই ভগবানের লীলাবিলাসে সহায়তা করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণী বহুরূপে প্রকাশিত হন। ব্রজে বিভিন্ন যূথে বিভিন্ন ভাব ও রস অনুসারে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে রাসনৃত্য ও অন্যান্য লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করান। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন

শ্রীগোবিন্দের আনন্দায়িনী এবং তিনি গোবিন্দের মোহিনীও। তিনি শ্রীগোবিন্দের সর্বস্ব এবং সমস্ত কান্তাদের শিরোমণি। যাঁর অন্তরে ও বাইরে সর্বত্রই কৃষ্ণ বিরাজ করেন, তিনিই 'কৃষ্ণময়ী'। তিনি যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, সেখানেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

প্রশ্ন-১৭। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৪র্থ পরিচ্ছেদের ১৬৪,১৬৫,১৬৬ শ্লোক তিনটি লিখ এবং ব্যাখ্যা দাও।

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি, 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।
কামের তাৎপর্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য-মাত্র প্রেম ত' প্রবল।।

ব্যাখ্যাঃ কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ঠিক যেমন লোহার সঙ্গে সোনার পার্থক্য। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাকে বলা হয় কাম, আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকাদের প্রেম কামগন্ধহীন। জনপ্রিয়তা, সন্তান-সন্ততি লাভ, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি প্রভৃতি বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিধি সেগুলি আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির বিভিন্ন স্তর। জনসেবা, জাতীয়তাবোধ, ধর্মাচরণ, পরার্থবাদ, নীতিবোধ, শাস্ত্রনির্দেশ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সকামকর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি, প্রগতি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহমমতা, অথবা সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় অথবা আইনের দ্বারা দণ্ডভোগ করার ভয় প্রভৃতির আবরণে ইন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সবই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বিভিন্ন স্তর। কামের উদ্দেশ্য কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ। কিন্তু প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধন করা এবং তাই তা অত্যন্ত প্রবল।

প্রশ্ন-১৮। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৫ম পরিচ্ছেদের ৪, ১৪২,১৪৬,২১৮,২১৯,২২০,২৩২,২৩৪ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।।
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।।
অদ্বৈত আচার্য,— নিত্যানন্দ, দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে।।
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন।।
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে।।
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়।।
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
'সহস্রবনে' শেষ নাহি পায় যাঁর।।

শ্লোকার্থঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। শ্রীবলরাম হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় দেহ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই তাঁর সেবক। তিনি যেভাবে নির্দেশ দেন, তাঁরা সেভাবেই নৃত্য করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন ভগবানের দুটি অঙ্গ এবং তাঁর প্রধান পার্ষদ। তাঁদের দুজনকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্নভাবে তাঁর লীলাবিলাস করেন। বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পবৃক্ষের বনে রত্নমণ্ডপে এক রত্নসিংহাসনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ বসে আছেন এবং মাধুর্য প্রকাশ ক'রে তিনি জগৎকে মোহিত করছেন। তাঁর বাম পার্শ্বে রয়েছেন সখী পরিবৃতা শ্রীমতী রাধারাণী। তাঁর সঙ্গে শ্রীগোবিন্দদেব নানা রঙ্গে রাস আদি লীলা উপভোগ করেন। বৃন্দাবনে এসে আমি সেই সবই পেয়েছি এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুণের মহিমা অপার। এমন কি সহস্র বদনে কীর্তন করেও শেষ তাঁর অন্ত পান না।

প্রশ্ন-১৯। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৪, ২৯,৭৮,৮৬,৮৭,৯৫,১১৩,১১৪ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ।।

ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য' ।।
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন।।
চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস।।
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য হৈঞা সুস্থির।।
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন।।
অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার।।
সংকীর্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল।।

শ্লোকার্থঃ মহাবিষ্ণু হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন তাঁরই অবতার। ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ নেই, তাই তাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য। সহস্র বদন শেষ-সঙ্কর্ষণ দশ রূপ ধারণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস। আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস এবং তাঁর দাসের অনুদাস। এই বলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নৃত্য করলেন, গান করলেন এবং গম্ভীরভাবে হুঙ্কার করলেন। তার পরেই তিনি স্থির হয়ে বসলেন। শেষ-সঙ্কর্ষণ, যিনি তাঁর মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করেন, তিনি কায়ব্যূহ প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা অপার, তাঁর ঐকান্তিক হুঙ্কারের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সংকীর্তন প্রচার করে তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করলেন। এভাবেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর কৃপার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবৎ প্রেমরূপ সম্পদ লাভ করল।

প্রশ্ন-২০। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৭ম পরিচ্ছেদের ৪,৯,১২,১৩,১৬,১৭,২৩,৭৪,১৪৪ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তন রঙ্গে।।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য।।
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই।।
'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য-গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই।।
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন।।
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার।।
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম।।
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন।।

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই পঞ্চতত্ত্ব নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহানন্দে সংকীর্তন করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পার্ষদগণও তাঁরই মতো মহিমান্বিত। এই কারণে পরম শিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করেন এবং ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত-অবতার। তাই এই তিন তত্ত্ব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু) হচ্ছেন ঈশ্বরতত্ত্ব বা প্রভু। শ্রীবাসাদি ভগবানের আর যে অনন্ত কোটি ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব। গদাধর পণ্ডিতাদি ভক্তরা হচ্ছেন ভগবানের শক্তি-অবতার। তাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত। ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদেরা কে যোগ্য কে অযোগ্য সেই কথা বিচার না ক'রে, স্থান-অস্থানের বিচার না ক'রে, যেখানে যাকে পেয়েছেন, তাঁকেই ভগবৎ-প্রেম দান করেছেন। এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর কোনো ধর্ম নেই। এই নাম হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম। ভগবৎ-প্রেম এমনই এক অমূল্য সম্পদ যে, তাকে মানব-জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করার ফলে মাধুর্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায় এবং এই জন্মেই সেই রস আস্বাদন করা যায়। মুক্তি হচ্ছে চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এর শেষ স্তর। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির স্তর মুক্তিরও উর্ধ্বে। এই স্তরকে বলা হয় পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তির এই মাধুর্য রসের স্তরে অর্থাৎ কুঞ্জলীলায় এই জন্মেই প্রবেশ করা যায়।

প্রশ্ন-২১। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৮ম পরিচ্ছেদের ৪৪, ৪৮,৪৯,৭১→৭৮,৮২ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্য-মঙ্গল'।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল।।
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ।।
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন।।
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন।।
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে।।
দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন।।
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল।।
সব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল।।
আজ্ঞামালা পায়া আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ।।
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন'।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন।।
চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন-দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ।।

শ্লোকার্থঃ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বর্ণনা করার সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে সেই লীলা বর্ণনা করলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ লীলা অব্যক্তই রয়ে গেল। সেই সমস্ত লীলার বর্ণনা শুনতে বৃন্দাবনবাসী সকল ভক্তের মন উৎকণ্ঠিত হল। বৃন্দাবনে আরও অনেক মহান ভক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা শ্রবণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। তাঁরা সবাই করুণা ক'রে আমাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের আদেশেই আমি নির্লজ্জের মতো শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার চেষ্টা করছি। বৈষ্ণবের আজ্ঞা পেয়ে চিন্তিত অন্তরে আমি মদনগোপালের মন্দিরে গিয়েছিলাম তাঁর আদেশ ভিক্ষা করার জন্য। আমি যখন মন্দিরে মদনমোহন দর্শন করতে গেলাম, তখন পূজারী গোসাঞিদাস ভগবানের শ্রীচরণের সেবা করছিলেন। তখন আমিও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা নিবেদন করলাম। ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমি যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম, তখন তাঁর গলা থেকে একটি মালা খসে পড়ল। তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, 'হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!' এবং পূজারী গোসাঞিদাস সেই মালাটি এনে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। সেই আজ্ঞামালা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমি এই গ্রন্থ রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

আমি লিখিনি, শ্রীমদনমোহন আমাকে দিয়ে তা লিখিয়েছিলেন। আমার লেখা ঠিক শুক পক্ষীর (তোতা পাখির) পুনরাবৃত্তির মতো। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় ব্যাসদেব। তাই, তাঁর কৃপা ছাড়া এই সমস্ত লীলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-২২। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ৯ম পরিচ্ছেদের ৯,২১,২২,২৩,২৫,২৭,৩৬,৩৭,৪১,৪৭, শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ। (বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গকে মূল বৃক্ষরূপে বিবেচনা করে ভক্তিবৃক্ষের মালাকার এবং তার ফলের দাতা ও ভোক্তা বলে বর্ণনা করেছেন।)

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি।।
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ'।।
সেই দুইস্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল।।
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা।।
উডুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে।।
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল।।
অতএব আমি আজ্ঞা দিলু সবাকারে।
যাহা তাহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে।।
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব।।
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।
এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার।।

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি-কল্পতরু পৃথিবীতে আনয়ন ক'রে তার মালাকার হলেন। তিনি সেই বীজ রোপণ ক'রে তাতে ইচ্ছারূপ বারি সিঞ্চন করলেন। বৃক্ষের উপরের স্কন্ধ থেকে দুটি শাখা হল, তার একটি হলেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং অপরটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। এই দুটি স্কন্ধ থেকে বহু শাখা ও উপশাখা সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেলল। এর শাখা, উপশাখা এবং তার উপশাখা এত অসংখ্য হল যে, কারও পক্ষে তা লেখা সম্ভব নয়। একটি বৃহৎ ডুমুর বৃক্ষের সর্ব অঙ্গে যেমন ফল ধরে, তেমনই ভক্তিবৃক্ষের সর্ব অঙ্গেও ফল ধরে। ফলগুলি পেকে অমৃতের থেকেও মধুর হল। মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন মূল্য না নিয়ে সেগুলি বিতরণ করলেন। তাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ ক'রে সর্বত্র তা বিতরণ করার জন্য আমি এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আদেশ দিলাম। আমি একলা মালাকার। এই ফল যদি আমি বিতরণ না করি, তা হলে আমি সেগুলি নিয়ে কি করব? আমি একলা কত ফল খাব? যারা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের জন্ম সার্থক করে পর-উপকার করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়ে বৃক্ষের বংশধরেরা (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা) পরম আনন্দিত হলেন।

প্রশ্ন-২৩। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১১তম পরিচ্ছেদের ৫,৬,৭,২১,৫৪,৫৫,৫৬,৫৮ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ ও তাৎপর্য লিখ।

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর।।
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভূবন।।
অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন।।
নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা।।
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহো করিল রচন।।

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস।।
সর্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই।।
এই সর্বশাখা পূর্ণ—পক্ব প্রেমফলে।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে।।

শ্লোকার্থ ও তাৎপর্যঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য-বৃক্ষের অত্যন্ত গুরুপূর্ণ একটি স্কন্ধ। তার থেকে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছারূপ জলের দ্বারা এই সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলি অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে লাগল এবং প্রেমযুক্ত ফুলে-ফলে তা ভুবন ছেয়ে ফেলল। এই শাখা-প্রশাখারূপ ভক্তদের সংখ্যা অগণিত ও অন্তহীন। কে তা গণনা করতে পারেন? তবুও নিজেকে পবিত্র করার জন্য আমি তাঁদের মধ্যেকার মুখ্য কয়েকজন ভক্তের কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত ভক্তরা সকলেই ব্রজের সখ্য-রসাশ্রিত এবং তাঁদের সকলেই গোপালবেশ। তাঁদের হাতে শৃঙ্গ ও বেত্র, আর তাঁদের মাথায় ময়ূরের পাখা। শ্রীমতী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ (পরবর্তীকালে যা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ হয়) রচনা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় ব্যাসদেব হচ্ছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সমস্ত শাখার মধ্যে বীরভদ্র গোসাঞি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর যত উপশাখা তারও অন্ত নেই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই সমস্ত ভক্তশাখা কৃষ্ণভক্তিরূপ সুপক্ব ফলে পরিপূর্ণ। যাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদেরই তাঁরা এই ফল বিতরণ করেছেন। এভাবেই তাঁরা কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবনে সকলকে ভাসিয়েছেন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে বৈষ্ণবের সম্পদ। তাই তিনি এই উভয় বস্তু তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যাকে-তাকে দান করতে পারেন। তাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে হলে শুদ্ধ ভক্তের কৃপা লাভ করতে হয়।

প্রশ্ন-২৪। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১২তম পরিচ্ছেদের ৪,৬,১০,৫০,৫১,৫২,৬৬,৭১,৭২,৭৯ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ। (সরস্বতী ঠাকুর কোনো বিশেষ একজনকে আচার্য হওয়ার নির্দেশ দেন নাই। শ্লোক-৮ এর তাৎপর্য দেখ)

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য-গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি।।
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল।।
আচার্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার।।
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।।
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন।।
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম-কীর্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি'।।
মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা, —ফুল-ফল পায়।।
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড।।
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি।।
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন।।

শ্লোকার্থঃ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন সেই বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ। তাঁর এত শাখা যে, সকলের কথা লিখে বর্ণনা করা যায় না। সেই স্কন্ধে যত ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল ফলল তা এত অসংখ্য যে, তার ফলে কৃষ্ণপ্রেমে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হল। আচার্যের যে মত, সেই মতই হচ্ছে সার। যে সেই মত লঙ্ঘন করে, সে তৎক্ষণাৎ অসার হয়ে যায়। আমার গুরুদেব শ্রীঅদ্বৈত আচার্য কখনোই ধনী ব্যক্তি বা রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ করেননি। কারণ, গুরু যদি বিষয়ীর কাছ থেকে অন্ন অথবা অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর মন দুষ্ট হয়। মন কলুষিত হলে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না; আর কৃষ্ণস্মৃতি যদি ব্যাহত হয়, তা হলে জীবন নিষ্ফল হয়। এভাবেই সাধারণ মানুষের চোখে ছোট

হতে হয়, কেন না তার ফলে তাঁর ধর্ম ও কীর্তির হানি হয়। বৈষ্ণবের, বিশেষ ক'রে আচার্যের কখনও এই রকম আচরণ করা উচিত নয়। সব সময়ই সেই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। অদ্বৈত আচার্যরূপ স্কন্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ মালীর দেওয়া জল সরবরাহ করেন। এভাবেই শাখা-উপশাখাগুলি পুষ্ট হয় এবং তাতে প্রচুর ফুল ও ফল হয়। অদ্বৈত আচার্যের বিপথগামী গণেরাই কেবল নয়, চৈতন্য-বিমুখ যে জন, সেই পাষণ্ড এবং যমরাজ তাকেও দণ্ড দান করবেন। তা তিনি পণ্ডিতই হোন, মহা তপস্বী হোন, সার্থক গৃহস্থ হোন অথবা বিখ্যাত সন্ন্যাসী হোন, তিনি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরোধী হন, তা হলে তাকে যমরাজের হাতে দণ্ডভোগ করতেই হবে। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শাখা ও উপশাখা বর্ণনা ক'রে, আমি এখন শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রধান প্রধান শাখা ও উপশাখার বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন-২৫। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১৩তম পরিচ্ছেদের ৮,৯,১০,১১,৩২,৩৯,৪০,৪১,৫২,৫৩,৭০,৭১ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি।।
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ-কীর্তন-বিলাস।।
চব্বিশ বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।।
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া।।
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-চ্ছলে।।
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন।।
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে।।
কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি' ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার।।
আগে অবতারিলা যে যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার।।
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া।।
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার।।

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতরণ করেন এবং আটচল্লিশ বছর প্রকট থেকে তাঁর লীলাবিলাস সাঙ্গ করেন। ১৪০৭ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন এবং ১৪৫৫ শকাব্দে তিনি এই জগৎ থেকে অপ্রকট হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন ক'রে চব্বিশ বছর ছিলেন। তখন তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন বিলাস করেন। চব্বিশ বছরের শেষে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং আর চব্বিশ বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে বাস করেন। সংকীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু নগরে নগরে ভ্রমণ করতেন। এভাবেই প্রেমভক্তি বিতরণ ক'রে তিনি সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করেন। বাকি বারো বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে থেকে, নিজে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন ক'রে সকলকে শিক্ষা দিলেন কিভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করতে হয়। দিন-রাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ অনুভব করতেন। সেই বিপ্রলম্ভ ভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশ ক'রে তিনি উন্মাদের মতো কখনও কাঁদতেন, কখনও প্রলাপ বলতেন। উদ্ধবকে দেখে শ্রীমতী রাধারাণী যেমন প্রলাপ বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনই শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়ে রাত-দিন উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন। তাঁর মনের কোন এক বিশেষ বাসনা পূর্ণ করার জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ গভীরভাবে বিচার ক'রে এই লোকে অবতীর্ণ হতে মনস্থ করেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর পরিবারের গুরুজনদের পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। আমি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করছি, কেন না পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করাবার প্রতিজ্ঞা ক'রে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন। হুঙ্কার ক'রে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করতে আহ্বান করতে লাগলেন এবং তাঁর এই পুনঃপুনঃ আহ্বানে ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আকৃষ্ট হলেন।

প্রশ্ন-২৬। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১৩তম পরিচ্ছেদের ৮০,৮৫,৮৯,৯২,৯৪ শ্লোক, ১৪তম পরিচ্ছেদের ৩৭,৩৮ শ্লোক এবং ১৫তম পরিচ্ছেদের ৮,৯,১০,১৬ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে।।
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে।।
চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ।।
এত জানি' রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন।।
জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি।।
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার।।
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া।।
এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, —মাতা, মোরে দেহ এক দান।।
মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে।।
শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা।।
একদিন নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হাঞা।।

শ্লোকার্থঃ ১৪০৬ শকাব্দের মাঘ মাসে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার দেহে প্রবেশ করেন। আমার হৃদয় থেকে তা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। তাই আমি বুঝতে পারছি যে, কোনো মহাত্মা নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করবেন। এভাবেই ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভক্ষণের উদয় হল। তা বিবেচনা করে রাহু পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করল এবং তখন 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি। হরি!' এই নামে ত্রিভুবন প্লাবিত হল। এভাবেই সমস্ত জগতের লোক যখন পরমেশ্বর ভগবানের নাম কীর্তন করছিলেন, তখন গৌরহরি রূপে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। এক সময় মহাপ্রভু তিন তিনবার এক ব্রাহ্মণ অতিথির ভগবানকে নিবেদিত ভোগ খেয়ে ফেলেছিলেন এবং তারপর গোপনে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। শৈশবে এক সময় দুটি চোর মহাপ্রভুকে বাইরে পেয়ে তাঁকে চুরি ক'রে নিয়ে যায়। মহাপ্রভু সেই চোরদের কাঁধে চড়েন এবং তারা যখন মনে করছিল যে, নির্বিঘ্নে সেই শিশু মহাপ্রভুকে নিয়ে তারা তাঁর গায়ের সমস্ত গয়নাগুলি চুরি করবে, তখন মহাপ্রভু তাদের এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করেন যে, তাদের নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার পরিবর্তে চোরেরা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মায়ের পায়ে প্রণতি নিবেদন ক'রে বলেছিলেন, মা। আমাকে কি তুমি একটি দান দেবে? তাঁর মা উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব।" তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন, দয়া ক'রে একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করবে না। শচীমাতা বলেছিলেন, "তুমি ভাল কথাই বলেছ। আমি একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করব না।" সেই দিন থেকে তিনি একাদশীর উপবাস করতে শুরু করেন। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানকে নিবেদিত সুপারি খেয়েছিলেন এবং তা মাদক দ্রব্যের মতো ক্রিয়া করার ফলে তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন।

প্রশ্ন-২৭। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১৬তম পরিচ্ছেদের ২৮,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৪৭,৫৩,৫৪,৮৭,১০৫,১০৬,১০৭,১০৮ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে।।
প্রভু কহে, ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি।।

কাঁহা তুমি সর্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন।।
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন।।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা।।
প্রভু কহেন,—কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ।।
কবি কহে,—কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ।
প্রভু কহেন,—কহি, শুন, না করিহ রোষ।।
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার।।
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত।।
এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন।।
সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুকে জানিল।।
প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন।।
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ।।

শ্লোকার্থঃ এক পূর্ণিমার রাত্রে মহাপ্রভু বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে, গঙ্গার তীরে বসে বিদ্যার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ, ব্যাকরণের অধ্যাপক বলে আমার খ্যাতি রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণের জ্ঞান আমি আমার শিষ্যদের বুঝাতে পারি না, আর তারাও আমাকে বুঝতে পারে না। কোথায় সর্বশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন এবং কবিতা রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী আপনি, আর কোথায় নবীন পড়ুয়া শিশু আমি। তাই আপনার কবিত্ব শুনতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। আপনি যদি কৃপা ক'রে কিছু গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেন, তা হলে আমরা শুনতে পারি। সেই কথা শুনে কেশব কাশ্মীরী আরও গর্বিত হলেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি গঙ্গার মহিমা বর্ণনা ক'রে একশোটি শ্লোক রচনা ক'রে আবৃত্তি করলেন। মহাপ্রভু বললেন, আপনি যদি রুষ্ট না হন, তা হলে আমি আপনাকে কিছু বলব। আপনি কি বলতে পারেন, এই শ্লোকে কি কি দোষ রয়েছে? কবি বললেন, তুমি তা হলে বল এতে কি গুণ আছে এবং দোষ আছে। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, আমি তা বলছি, দয়া করে আপনি রুষ্ট হবেন না। এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ রয়েছে এবং পাঁচটি অলঙ্কার রয়েছে। একে একে আমি সেগুলি বর্ণনা করছি। দয়া ক'রে আপনি সেগুলি বিচার ক'রে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিস্মিত হলেন। তাঁর প্রতিভা স্তম্ভিত হল এবং তাঁর মুখে কোনো কথা বের হল না। এভাবেই কেশব কাশ্মীরী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন এবং সেই রাত্রে কবি সরস্বতীর আরাধনা করলেন। স্বপ্নে সরস্বতীদেবী তাঁকে জানালেন মহাপ্রভু আসলে কে এবং এভাবেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জানতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। পরের দিন সকালবেলা, কেশব কাশ্মীরী এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে কৃপা করলেন এবং তাঁর ভববন্ধন মোচন করলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভাগ্যবান এবং তাঁর জন্ম সার্থক, কেন না তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করলেন।

প্রশ্ন-২৮। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১৭তম পরিচ্ছেদের ৮,৯,৭৫,১২১,১২৪,১২৫,১২৯,১৩০,১৩৯,১৫২ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন।।
দীক্ষা-অনন্তরে হৈল, প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস।।
জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তি-রস।।

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা।।
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি’ সবে কৈল নিবেদন।।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।।
এত বলি’ কাজী গেল,—নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক।।
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ করহ কীর্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন।।
এই মত কীর্তন করি’ নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজীদ্বারে গেলা।।
প্রভু কহে,—প্রশ্ন লাগি, আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে, —আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে।।

শ্লোকার্থঃ তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গয়াতে গমন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে শ্রীল ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ হয়। গয়াতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই তিনি ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে শুরু করেন। দেশে ফিরে আসার পর পুনরায় তিনি সেই প্রেম-লক্ষণ প্রদর্শন করান। দার্শনিক জ্ঞান, সকাম কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ আদির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রেমভক্তিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়। মহাপ্রভু নবদ্বীপের সমস্ত নাগরিকদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে আদেশ দিলেন এবং তখন সকলে ঘরে ঘরে কীর্তন করতে লাগলেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সেই প্রচণ্ড শব্দ শুনে, স্থানীয় মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যাবেলায় চাঁদকাজী একটি বাড়িতে এলেন এবং দেখতে পেলেন যে. সেখানে কীর্তন হচ্ছে। কীর্তনরত সেই মানুষদের হাত থেকে একটি মৃদঙ্গ ছিনিয়ে নিয়ে সেটি মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙ্গে তিনি (চাঁদকাজী) বললেন—আমি কি জানতে পারি, কার বলে তোমরা এটি করছ? সেই কথা বলে চাঁদকাজী ঘরে ফিরে গেল এবং ভক্তরা অন্তরে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন আদেশ দিলেন, যাও গিয়ে সংকীর্তন কর। আজ আমি সমস্ত যবনদের সংহার করব! এভাবেই কীর্তন করতে করতে সারা নগর ভ্রমণ করে, তাঁরা অবশেষে কাজীর বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, ‘মামা! আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য আপনার বাড়িতে এসেছি’। তার উত্তরে চাঁদকাজী বললেন, হ্যাঁ, তোমার মনে কি প্রশ্ন আছে তা তুমি বল।

প্রশ্ন-২৯। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১৭তম পরিচ্ছেদের ১৫৩,১৫৪,১৫৫,১৫৬,১৫৭,১৫৮,১৫৯,১৬০,১৬১,১৬২,১৬৩,১৬৫,১৬৬,১৬৭ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

প্রভু কহে,—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা।।
পিতা-মাতা মারি’ খাও—এবা কোন্ ধর্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম।।
কাজী কহে,—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব ‘কোরাণ’।।
সেই শাস্ত্রে কহে,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ।।
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয়।।
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি।।
প্রভু কহে,—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ।।
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী।।

অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন।।
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার।।
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে।।
তোমরা জীয়াইতে নার,—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।।
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর।।
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম ঐছে আজ্ঞা দিল।।

শ্লোকার্থঃ মহাপ্রভু বললেন, আপনি গরুর দুধ খান; সেই সূত্রে গাভী হচ্ছে আপনার মাতা। আর বৃষ অন্ন উৎপাদন করে, যা খেয়ে আপনি জীবন ধারণ করেন; সেই সূত্রে সে আপনার পিতা। যেহেতু বৃষ ও গাভী আপনার পিতা ও মাতা, তা হলে তাদের হত্যা ক'রে তাদের মাংস খান কি ক'রে? এটি কোন্ ধর্ম? কার বলে আপনি এই পাপকর্ম করছেন? কাজী উত্তর দিলেন, তোমার যেমন বেদ, পুরাণ আদি শাস্ত্র রয়েছে, তেমনই আমাদের শাস্ত্র হচ্ছে কোরান। কোরান অনুসারে, উন্নতি সাধনের দুটি পথ রয়েছে—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যদি বধ করা হয়, তা হলে কোনো পাপ হয় না। পণ্ডিত কাজী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, তোমার বৈদিক শাস্ত্রে গোবধের নির্দেশ রয়েছে। সেই শাস্ত্র-নির্দেশের বলে বড় বড় মুনিরা গোমেধ-যজ্ঞ করেছিলেন। কাজীর উক্তি খণ্ডন ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, বেদে স্পষ্টভাবে গোবধ নিষেধ করা হয়েছে। তাই যে কোন হিন্দু, তা তিনি যেই হোন না কেন, কখনও গোবধ করেন না। বেদ ও পুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি কোন প্রাণীকে নবজীবন দান করতে পারে, তা হলে গবেষণার উদ্দেশ্যে সে প্রাণী মারতে পারে। তাই মুনি-ঋষিরা অতি বৃদ্ধ ও জরদ্গব পশুদের কখনও কখনও মেরে, বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে তাদের নবজীবন দান করতেন। এই ধরনের বৃদ্ধ ও পঙ্গু জরদ্গাব পশুদের যখন এভাবেই নবজীবন দান করা হত, তাতে তাদের বধ করা হত না, পক্ষান্তরে তাদের মহা উপকার সাধন করা হত। পূর্বে মহা শক্তিশালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কার্য সাধন করতে পারতেন, কিন্তু এখন এই কলিযুগে সেই রকম শক্তিশালী কোন ব্রাহ্মণই নেই। তাই গাভী ও বৃষদের নবজীবন দান করার যে গোমেধ-যজ্ঞ, তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তোমরা মুসলমানেরা পশুকে নবজীবন দান করতে পার না, তোমরা কেবল হত্যা করতেই পার। তাই তোমরা নরকগামী হচ্ছ, সেখান থেকে তোমরা কোনভাবেই নিস্তার পাবে না। গাভীর শরীরে যত লোম আছে তত হাজার বছর গোহত্যাকারী রৌরব নামক নরকে অকল্পনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। তোমাদের শাস্ত্রে বহু ভুলভ্রান্তি রয়েছে। শাস্ত্রের মর্ম না জেনে, সে সমস্ত শাস্ত্রের প্রণয়নকারীরা এমন ধরনের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা বিচারের কোন ভিত্তি নেই এবং প্রমাণও নেই।

প্রশ্ন-৩০। চৈ.চ.আ.লী গ্রন্থে ১৭তম পরিচ্ছেদের ১৬৮,১৬৯,১৭০,১৭১,২১৫,২২০,২২৬,২৬৪,২৬৫,২৬৮, ২৭২,২৭৫, ২৭৯,৩০৬, ৩০৭ শ্লোকগুলিসহ শ্লোকার্থ লিখ।

শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি'।।
তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয়।।
কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।।
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আর বার।।
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন।।
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর,—যেন তোমারে রহু ভক্তি।।
এই মতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ।।

মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার।।
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব।।
এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে।।
এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই' সন্ন্যাস করিলা।।
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্বিধ ভক্ত-ভাব করে আস্বাদন।।
শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন।।
অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার।।
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার।।

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথা শুনে কাজীর সমস্ত যুক্তি স্তব্ধ হল, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। এভাবেই পরাজয় স্বীকার ক'রে কাজী বিচারপূর্বক বললেন—নিমাই পণ্ডিত। তুমি যা বললে তা সবই সত্য। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক এবং তাই তার নির্দেশগুলি দার্শনিক বিচার বা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমি জানি যে আমাদের শাস্ত্র বহু ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনায় পূর্ণ, তবুও যেহেতু আমি মুসলমান, তাই সম্প্রদায়ের খাতিরে আমি সেগুলি স্বীকার করি। কাজী বললেন, স্বাভাবিক ভাবেই যবন-শাস্ত্রের বিচার দৃঢ় নয়। সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্মিত হেসে তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আমি জানি নারায়ণ হচ্ছেন হিন্দুদের পরম ঈশ্বর এবং আমার মনে হচ্ছে যেন তুমিই হচ্ছ সেই নারায়ণ। তোমার কৃপার প্রভাবে আমার দুষ্টমতি সংশোধিত হল। এবার তুমি আমাকে এমন কৃপা কর যেন তোমার প্রতি আমার ভক্তি সর্বদা অক্ষুণ্ন থাকে। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে কৃপা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হন। যে সমস্ত অধঃপতিত জীব আমার নিন্দা করে এবং আমাকে প্রণাম করে না, আমি অবশ্যই তাদের উদ্ধার করব। তাই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব, কেন না তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আমাকে সন্ন্যাসী বলে মনে ক'রে প্রণাম করবে। এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহে বাস করতে লাগলেন। সেই সময় কেশব ভারতী নদীয়া নগরে এলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। কেশব ভারতী তখন উত্তর দিলেন, আমাকে দিয়ে আপনি যা করাতে চান আমি তাই করব। সেই কথা বলে কেশব ভারতী কাটোয়াতে গেলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান যিনি যশোদানন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিই এখন শচীমাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে চতুর্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। মাথায় তাঁর ময়ূরপুচ্ছ, গলায় তাঁর গুঞ্জামালা এবং পরনে তাঁর গোপবেশ। তাঁর দেহ তিনটি স্থানে বাঁকা আর তাঁর মুখে বাঁশি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস অচিন্ত্য ও অদ্ভুত। তাঁর ভাব বিচিত্র, তাঁর গুণ বিচিত্র এবং তাঁর ব্যবহারও বিচিত্র। যে দুরাচারী ব্যক্তি জড় যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে তা মানে না, সে কুম্ভীপাকে দগ্ধ হবে, তার নিস্তার নেই।

প্রশ্ন-৩১। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকটির অর্থ লিখ।

সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময়।
প্রভুপদে কেহ কিছু করিয়া বিনয়।। (১-২২১)
ইহাঁ হৈতে চল, প্রভু, ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমাকে ভক্তি করে গৌড়রাজ।। (১-২২২)
তথাপি যবন জাতি, না করি প্রতীতি।
তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি।। (১-২২৩)
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন-যাত্রার এ নহে পরিপাটী।। (১-২২৪)
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময়।। (১-২২৫)

দিন কত রহি' তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন।। (১-২৩৭)
দিন চার কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দোখয়া দেখে দ্বাদশ কানন।। (১-২৩৯)
ছয় বৎসর ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রবাস।। (১-২৪৬)
নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ।। (১-২৫১)

শ্লোকার্থঃ সমস্ত বৈষ্ণবদের আদেশ গ্রহণ ক'রে বিদায় গ্রহণ করার সময়, দুইভাই শ্রীলরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করলেন—প্রভু! যদিও বাংলার নবাব হুসেন শাহ তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তবুও যেহেতু তোমার এখানে আর কোনো কাজ নেই, তাই আর এখানে থেকো না। যদিও নবাব তোমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, কিন্তু তবুও জাতিতে সে যবন এবং তাঁকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবনের তীর্থযাত্রায় যখন আপনি যাচ্ছেন, তখন এত লোকের আপনার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রভু! হাজার হাজার লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করতে যাওয়া ঠিক নয়। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাই তাঁর কোনো ভয় ছিল না, তবুও মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি সাধারণ মানুষের মত আচরণ করেছিলেন। কয়েকদিন জগন্নাথপুরীতে থাকার পর মহাপ্রভু রাত্রিবেলায় সকলের অগোচরে শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন এবং কেউ তা জানতে পারল না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চার দিন কাশীতে ছিলেন এবং তারপর সেখান থেকে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। মথুরা দর্শন ক'রে তিনি দ্বাদশ কানন দর্শন করলেন। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছয় বৎসর ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন। কখনো কখনো তিনি এখানে ওখানে ভ্রমণ ক'রে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেছিলেন এবং কখনো তিনি শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর নাম কীর্তন ক'রে ভগবৎ-প্রেম আস্বাদনের লীলাবিলাস করেছিলেন। অচণ্ডালে প্রেমভক্তি দান ক'রে তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৩২। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর।। (২-৩)
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।। (২-৪)
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ।। (২-৫)
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ পাঁঞ ব্রজেন্দ্রনন্দন।। (২-১৫)
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক।। (২-১৬)

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ ন জীয়য়।। (২-৪৩)
কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মশীবিন্দু।। (২-৪৮)

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ।। (২-৭৭)
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত।। (২-৮৭)

শ্লোকার্থঃ শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর কৃষ্ণবিরহ জনিত ভাব প্রকাশ করেছেন। বৃন্দাবনে উদ্ধবকে দর্শন ক'রে শ্রীমতী রাধারাণীর যে অবস্থা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থাও দিবা-রাত্র ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর কৃষ্ণবিরহ জনিত অপ্রাকৃত উন্মাদনা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ছিল ভ্রমময় এবং তাঁর কথাবার্তা ছিল প্রলাপময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত ক'রে ক্রন্দন করতে করতে বলতেন, "আমার প্রাণনাথ মুরলীবদন কোথায়? আমি এখন কি করব? কোথায় গেলে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে খুঁজে পাব? কাকে আমি আমার হৃদয়ের কথা বলব? আমার দুঃখ কে বুঝবে? ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিরহে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।" শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ঠিক জাম্বুনদের সোনার মতো এবং সেই প্রেম নৃলোকে অনুপস্থিত। যদি তা দেখা যায়ও, তবে কখনো বিচ্ছেদ বা বিরহ হয় না। যদি বিচ্ছেদ হয়, তবে জীবন থাকে না। কৃষ্ণপ্রেম অত্যন্ত নির্মল, ঠিক গঙ্গাজলের মতো। সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু। সেই নির্মল অনুরাগে অন্য কোনো দাগ লুকোতে পারে না। সাদা কাপড়ে যেমন কালির দাগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, ঠিক তেমনই। অনুরাগের অভাব কালির দাগের মতো প্রবলভাবে চোখে পড়ে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচিত গান দিয়ে এবং জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দ শ্রবণ ক'রে মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে পরম আনন্দে রাত্রি ও দিন অতিবাহিত করেছিলেন। প্রথমে কেউ যদি তা বুঝতে নাও পারে, কিন্তু বারবার শোনার ফলে তার হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা প্রভাব যে, ধীরে ধীরে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারবার এই গ্রন্থ শ্রবণ করার জন্য, যার প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

প্রশ্ন-৩৩। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

পূর্বে শ্রীমাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্ধন।। (৪-২১)
প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান।। (৪-২২)
শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি'।
স্নান করি' বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি'।। (৪-২৩)
গোপাল-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লঞা।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া।। (৪-২৪)
পুরী এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান।। (৪-২৫)
বালকের সৌন্দর্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ।। (৪-২৬)
স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিঞা।। (৪-৩৫)
কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই।। (৪-৩৬)
গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে।
পর্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে।। (৪-৩৭)

শ্লোকার্থঃ এক সময় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ভ্রমণ করতে করতে তিনি গোবর্ধন পর্বতে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভাগবৎ প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন, তাই তাঁর রাত্রি-দিন জ্ঞান ছিল না। কখনো তিনি উঠে দাড়াচ্ছিলেন এবং কখনো তিনি ভুপতিত হচ্ছিলেন, কেননা গভীর ভগবৎ-প্রেম হেতু তাঁর স্থানাস্থান জ্ঞান ছিল না। গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা ক'রে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোবিন্দকুণ্ডে এসে স্নান করেন এবং তারপর সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। তখন এক গোপবালক এক ভাণ্ড দুধ নিয়ে এসে, মাধবেন্দ্র পুরীর সামনে সেটি রেখে দিয়ে মৃদু হেসে তাঁকে বললেন—'দয়া ক'রে এই দুধটুকু গ্রহণ করো। তুমি ক্ষুধার্ত হলেও কেন কারও কাছে খাবার চাও না? তুমি সব সময় কার ধ্যান করো?' সেই বালকের সৌন্দর্য দর্শন ক'রে মাধবেন্দ্র পুরী অত্যন্ত প্রীত হলেন। তার মধুর বাক্য শ্রবণ ক'রে তিনি তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন। শেষ রাত্রে তাঁর একটু তন্দ্রা এল। স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দেখলেন যে, সেই বালকটি তাঁর সামনে এসে তাঁর হাত ধরে তাঁকে একটি কুঞ্জে নিয়ে গেল। মাধবেন্দ্র পুরীকে সেই কুঞ্জটি দেখিয়ে বালকটি বলল, আমি এই কুঞ্জে থাকি এবং সেই জন্য প্রচণ্ড শীত, বৃষ্টি, ঝড় ও তাপে আমি বড্ড কষ্ট পাই। গ্রামের লোকদের নিয়ে এসে, তাদের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ থেকে নিয়ে যাও। তারপর আমাকে ভালভাবে পর্বতের উপরে রাখ।

প্রশ্ন-৩৪। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লেখ।

শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে।। (৪-৫০)
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল।। (৪-৫৪)
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল।।(৪-৫৭)
হেনমতে অন্নকুট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পন।।(৪-৭৫)
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার।। (৪-৮৬)
এইমত বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন।। (৪-১০৫)
গোপাল কহে, পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ', তবে সে জুড়ায়।। (৪-১০৬)
সেবার নির্বন্ধ—লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন।। (৪-১০৯)

শ্লোকার্থঃ সেই কথা শুনে, মহা আনন্দে সমস্ত লোক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে চললেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা বৃক্ষলতা ছেদন ক'রে কুঞ্জে প্রবেশ করার পথ প্রস্তুত করলেন। একটি পাথরের সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ বসানো হ'ল এবং একটি বড় পাথর অবলম্বন রূপে সেই বিগ্রহের পিছনে দেওয়া হ'ল। অভিষেকের সময় কেহ গীত করছিলেন কেহ নাচ্ছিলেন। এভাবেই তখন এক মহা-মহোৎসব হ'ল। গ্রামে যত দই, দুধ ও ঘি ছিল তা সবই নিয়ে আসা হয়েছিল। এভাবেই অন্নকূট সাজানো হ'ল এবং মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী সবকিছু গোপালকে নিবেদন করলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাব দেখে, সেখানে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হলেন। কৃষ্ণলীলায় যে অন্নকূট মহোৎসব হয়েছিল, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রভুর কৃপায় তাঁরা যেন সাক্ষাৎ সেই অন্নকূট মহোৎসবই দর্শন করলেন। এভাবেই দুই বৎসর ধরে মহা আড়ম্বরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবিগ্রহের সেবা করলেন। তারপর একদিন মাধবেন্দ্র পুরী একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, গোপাল তাঁকে বললেন, আমার শরীরের তাপ জুড়াচ্ছে না। মলয়-প্রদেশ থেকে চন্দন নিয়ে এসো এবং তা ঘষে আমার অঙ্গে লেপন কর, তাহলে আমার তাপ জুড়াবে। যাত্রা করার পূর্বে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ভগবানের নিয়মিত সেবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন এবং তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তারপর শ্রীগোপালের আদেশ নিয়ে. তিনি পূর্ব ভারতের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রশ্ন-৩৫। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

গ্রামের শূণ্যহাটে বসি' করেন কীর্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন।। (৪-১২৫)

নিজ কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন।। (৪-১২৬)
উঠহ, পূজারী, কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ।। (৪-১২৭)
মাধব-পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা।। (৪-১২৯)
ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী'।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।। (৪-১৩৩)
গোপাল চন্দন মাগে,—শুনি' ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন।। (৪-১৫০)
গোপাল আসিয়া কহে,—শুন হে মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব।। (৪-১৫৮)
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি'।। (৪-১৭৪)
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে।। (৪-১৯৬)
অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।। (৪-১৯৭)

শ্লোকার্থঃ মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাধবেন্দ্র পুরী গ্রামের এক শূণ্যহাটে কীর্তন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পূজারী গোপীনাথকে শয়ন দিলেন। তার কৃত্য সমাপন ক'রে পূজারী শয়ন করলেন। তখন স্বপ্নে শ্রীগোপীনাথদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন—পূজারী, ওঠ, মন্দিরের দ্বার খোল। আমি মাধবেন্দ্র পুরী নামক এক সন্ন্যাসীর জন্য একপাত্র ক্ষীর রেখে দিয়েছি। মাধবেন্দ্র পুরী শূন্যহাটে বসে আছেন। তুমি তাড়াতাড়ি এই ক্ষীর তাঁকে দিয়ে এসো। ক্ষীরপূর্ণ পাত্রটি নিয়ে পূজারী উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, 'যাঁর নাম মাধবেন্দ্র পুরী তিনি দয়া ক'রে এই ক্ষীর গ্রহণ করুন। আপনার জন্য গোপীনাথ এই ক্ষীর চুরি করেছেন।' গোপাল চন্দন চেয়েছেন শুনে, জগন্নাথ পুরীর সমস্ত ভক্তরা মহা আনন্দে চন্দন সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হলেন। স্বপ্নে মাধবেন্দ্র পুরী দেখলেন যে গোপাল তাঁর কাছে এসে বলছেন, 'হে মাধবেন্দ্র পুরী, আমি ইতিমধ্যে সমস্ত চন্দন ও কর্পূর গ্রহণ করেছি।' মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। তাই তিনি 'ক্ষীরচোরা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে, এই শ্লোকটি পাঠ করতে করতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। "হে দীনদয়ার্দ্র নাথ। হে মথুরানাথ। কবে আমি তোমাকে দর্শন করব? তোমার দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে। হে প্রিয়তম, এখন আমি কি করব?"

প্রশ্ন-৩৬। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

পূর্বে বিদ্যানগরের দুই ত'ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন।। (৫-১০)
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন।। (৫-১৭)
কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান।। (৫-২০)
ছোটবিপ্র কহে—'যদি কন্যা দিতে মন ।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন।।' (৫-৩১)
ছোটবিপ্র বলে,—'ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি।।' (৫-৩৩)
এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে, ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেই পারে।। (৫-৮৬)
কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুঃখ।। (৫-৮৯)

এত জানি’ তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময়।
জানি’ সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয়।। (৫-৯০)
হাসিয়া গোপাল কহে,—‘শুনহ,ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন।।’ (৫-৯৭)
উলটিয়া আমা তুমি না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে।। (৫-৯৮)
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা ।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা।।(৫-৯৯)

শ্লোকার্থঃ পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের বিদ্যানগরের দুজন ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্যটনে বার হন। ছোট বিপ্র সর্বদা বৃদ্ধ বিপ্রটির সেবা করতেন এবং তাঁর সেবায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বিপ্র বললেন—‘আমি যদি তোমাকে সম্মান প্রদর্শন না করি, তা হলে আমি কৃতঘ্ন হব। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি তোমাকে আমার কন্যা দান করব’। তখন ছোট বিপ্র গোপাল বিগ্রহকে সম্বোধন ক’রে বললেন, ‘হে ঠাকুর, তুমি আমার সাক্ষী রইলে। পরে যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে ডাকব’। ছোট বিপ্রের কথা শুনে, নাস্তিকেরা উপহাস করতে লাগল। আর অন্য কেউ কেউ বললেন, ভগবান অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি ইচ্ছা করলে আসতেও পারেন। ছোট বিপ্র বললেন, হে প্রভু, কন্যা লাভের আশায় যে আমি সুখ অনুভব করছি তা নয়।ব্রাহ্মণের যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হচ্ছে এই জন্যই আমার দুঃখ। আপনি অত্যন্ত দয়াময় এবং আপনি সব কিছুই জানেন। তাই দয়া ক’রে আপনি সাক্ষ্য দান করুন। যদি কোন ব্যক্তি জেনে-শুনেও সাক্ষ্য না দেয়, তা হলে তার পাপ হয়। শ্রীগোপাল তখন হেসে বললেন, ‘ব্রাহ্মণ, তোমার পেছনে পেছনে আমি যাব। তুমি পিছন ফিরে আমাকে দেখার চেষ্টা ক’রো না। আমাকে দেখলে আমি সেখানেই রয়ে যাব। আমি যে তোমার পিছন পিছন যাচ্ছি তা তুমি বুঝতে পারবে আমার নূপুরের শব্দ শুনে। নূপুরের শব্দ ব্রাহ্মণের মন আনন্দে পূর্ণ হ’ল।

প্রশ্ন-৩৭। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

নূপুরের ধ্বনি শুনি’ আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি’ করায় ভোজন।। (৫-১০২)
এইমতে চলি’ বিপ্র নিজে-দেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি’ মনেতে চিন্তিলা।। (৫-১০৩)
‘এবে মুঞি গ্রামে আইনু, যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন।। (৫-১০৪)
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয়।।’ (৫-১০৫)
এত ভাবি’ সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপাল-দেব তথায় রহিল।। (৫-১০৬)
এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি’ আছেন চিরকাল।। (৫-১১৯)
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্ত আর্য।
গোপাল-চরণে মাগে,—‘চল মোর রাজ্য’।। (৫-১২২)
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল।। (৫-১২৩)
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি ‘সাক্ষিগোপাল’, নাম হৈল খ্যাতি।। (৫-১৩৩)
দুহাঁ দেখি’ নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি’ হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে।। (৫-১৩৮)

শ্লোকার্থঃ গোপাল যখন তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অতি উত্তম অন্ন পাক ক’রে গোপালের ভোগ দিতে লাগলেন। এভাবেই চলতে চলতে ছোট বিপ্র অবশেষে তার দেশে ফিরে এলেন। গ্রামের নিকটে এসে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—‘এখন আমি আমার গ্রামে এসে পৌঁছেছি এবং আমি আমার বাড়ি যাব এবং সকলকে বলব যে, সাক্ষী এসে উপস্থিত হয়েছেন’। ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ‘সাক্ষাতে গোপালদেবকে দর্শন না করলে আমার মন স্থির হচ্ছে না, অথচ গোপালদেব যদি এখানেও থাকেন, অর্থাৎ তিনি যদি আমার পিছন পিছন আর না-ও যান, তা হলেও কোন ভয় নেই’। এই ভেবে, সেই ব্রাহ্মণ ফিরে চাইলেন এবং অমনি সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হেসে গোপালদেব সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এভাবেই বহুকাল ধরে সাক্ষিগোপাল

বিদ্যানগরে সেবা গ্রহণ ক'রে বিরাজ করছেন। মহারাজ পুরুষোত্তমদেব ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্ত এবং আর্য সভ্যতার কর্ণধার। তিনি গোপালের চরণে প্রার্থনা ক'রে বললেন, 'দয়া ক'রে তুমি আমার রাজ্যে চল'। তাঁর ভক্তিতে বশীভূত হয়ে, গোপালদেব তাঁর সেই প্রার্থনায় রাজী হলেন। মহারাজ পুরুষোত্তমদেব তখন তাঁকে কটকে নিয়ে এলেন। সেই থেকে গোপাল কটকে রইলেন এবং 'সাক্ষিগোপাল' নামে বিখ্যাত হলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীগোপাল-বিগ্রহ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এভাবেই দেখলেন, তখন তিনি ভক্তদের সঙ্গে তা নিয়ে ঠারাঠারি করতে লাগলেন এবং সমস্ত ভক্তেরা তখন হাসতে লাগলেন।

প্রশ্ন-৩৮। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে।। (৬-৩)
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি'।
আনন্দে সার্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি।। (৬-৩৮)
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।। (৬-৮৩)
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়।। (৬-১৪৮)
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার?।। (৬-১৫২)
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ডী।। (৬-১৬৭)
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক।। (৬-১৬৮)
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।। (৬-১৬৯)
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।। (৬-১৭২)
আচার্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল।। (৬-১৮০)
শুনি' ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার।। (৬-১৯৯)

শ্লোকার্থঃ ভগবৎ-প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আঠারোনালা থেকে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন ক'রে তিনি ভগবৎপ্রেমে অস্থির হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরি', 'হরি' বলে হুঙ্কার ক'রে উঠলেন। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহা-আনন্দে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। গোপীনাথ আচার্য আরো বললেন—'ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানতে পারেন। সাধারণ মানুষেরা বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারে না, তাই পুরাণের মাধ্যমে সেই অর্থ সহজবোধ্য করা হয়েছে। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—তাঁর বিগ্রহ নিত্য-আনন্দময়, আপনি সেই ভগবানকে নিরাকার ব'লে বর্ণনা করছেন? ভগবানের চিন্ময়রূপ যে মানে না সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী। তাকে দর্শন করা এবং স্পর্শ করা উচিত নয়। যমরাজ অবশ্যই তাকে দণ্ডদান করবেন। বৌদ্ধরা বেদ মানে না, তাই তারা নাস্তিক। কিন্তু যারা বেদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে, সেই সমস্ত মায়াবাদীরা বৌদ্ধদের চেয়ে অধিক নাস্তিক। বদ্ধজীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু কেউ যদি সেই সূত্রের মায়াবাদী-ভাষ্য শোনে, তাহলে তার সর্বনাশ হয়। শঙ্করাচার্যের মতবাদ প্রচার করে যে, পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বর পরিবর্তিত হন। এই মতবাদ স্বীকার ক'রে মায়াবাদীরা ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত ব'লে ঘোষণা করে। এইভাবে তারা বেদান্ত-সূত্রকে ভ্রান্ত ব'লে কল্পনা প্রসূত 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের কোনো দোষ নেই। তিনি কেবল ভগবানের আদেশ পালন করেছেন। তাই তিনি কল্পনা ক'রে নাস্তিক শাস্ত্র রচনা করেছেন। ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য চমৎকৃত হলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এবং তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করলেন।

প্রশ্ন-৩৯। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।। (৬-২৫৪)

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃপ্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ।। (৬-২৫৫)

এই মতে সার্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।। (৭-৩)

বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল।। (৭-১৩)

তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে।। (৭-৬১)

'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে।। (৭-৬২)

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্মস্থানে।
কূর্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে।। (৭-১১৩)

'কূর্ম' নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।। (৭-১২১)

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তাঁর' এই দেশ।। (৭-১২৮)

'বাসুদেব'-নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময়।। (৭-১৩৬)

অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা।। (৭-১৪০)

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল।। (৭-১৪১)

শ্লোকার্থঃ বৈরাগ্য-বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপধারী এক সনাতন পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, আমি তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করি। কালের বশে নিজ ভক্তিযোগকে বিনষ্ট প্রায় দেখে 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামক সনাতন পুরুষ তা পুনরায় প্রচার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হোক। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে প্রচার করতে ইচ্ছা করলেন। সর্বত্র মহাপ্রভু জানতেন যে বিশ্বরূপ ইতিমধ্যে তাঁর প্রকট লীলা সংবরণ করেছেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ ভারত উদ্ধার করার জন্য এই ছলনা করলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন—হে প্রভু, আপনার শ্রীচরণে আমার একটি অনুরোধ রয়েছে, আমি আশা করি আপনি অবশ্যই তা পালন করবেন। গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় নামক একজন উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী আছেন। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কূর্মস্থানে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে কূর্মদেবের বিগ্রহ দর্শন ক'রে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেন ও তাঁর স্তব করলেন। সেই গ্রামে 'কূর্ম' নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বহু শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর। আমার আজ্ঞায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তুমি এই দেশ উদ্ধার কর। বাসুদেব নামক একজন মহান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়েছিল এবং তার ক্ষতগুলি কৃমি কীটে পূর্ণ ছিল। নানাভাবে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে তার অন্তরের দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে দেহের কুষ্ঠও দূর হল এবং তার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গও সুন্দর হল।

প্রশ্ন-৪০। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

পূর্ববৎ 'বৈষ্ণব' করি' সর্ব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে।। (৮-১০)

হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায়।। (৮-১৪)

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কয় রহঃস্থানে।। (৮-৫৬)

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"।। (৮-৫৭)

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"

রায় কহে, "কৃষ্ণে কর্মার্পণ—সর্বসাধ্য-সার"।। (৮-৫৯)

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"।

রায় কহে, "স্বধর্ম-ত্যাগ,—এই সাধ্য-সার"।। (৮-৬১)

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"।

রায় কহে,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার"।। (৮-৬৪)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম।। (৮-৬৫)

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"।

রায় কহে, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার"।। (৮-৬৬)

প্রভু কহে—"এহো হয়, আগে কহ আর"।

রায় কহে,—"প্রেমভক্তি—সর্বসাধ্যসার"।। (৮-৬৮)

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর"।

রায় কহে, "দাস্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার"।। (৮-৭১)

শ্লোকার্থঃ পূর্বের মতো সকলকে বৈষ্ণবে পরিণত ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোদাবরী নদীর তীরে এলেন। সেই সময় বাদ্যযন্ত্র সহকারে দোলায় চড়ে স্নান করার জন্য রামানন্দ রায় সেখানে এলেন। রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিনম্র প্রণতি নিবেদন করলে পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর এক নির্জন স্থানে বসে তাঁদের আলোচনা শুরু করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জীবনের পরম উদ্দেশ্য নির্ধারণ ক'রে শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক শোনাতে বললেন। রামানন্দ রায় তার উত্তরে বললেন—"স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এটি বাহ্য। এর পরে যা আছে, তা বল"। তখন রামানন্দ রায় বললেন, "কৃষ্ণে কর্ম অর্পণই সকল সাধ্যের সার"। একথা শুনেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এটিও বাহ্য, এরও পরে যা আছে, তা বল"। রামানন্দ রায় তখন বললেন,—"স্বধর্ম-ত্যাগই সকল সাধ্যের সার"। এই কথা শুনেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এও বাহ্য, এরও পরে যা আছে, তা বল"। রামানন্দ রায় তখন বললেন—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে সাধ্যসার বলা যায়"। "ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—যিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত অভাব মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হন। তিনি কোনো কিছুর জন্য শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সেই স্তরে তিনি আমার শুদ্ধভক্তি লাভ করেন"। এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন,—"এও বাহ্য; এর পরে যা আছে, তা বল"। রামানন্দ রায় বললেন,—"জ্ঞান-শূন্যা-ভক্তি সাধ্য বস্তুর সার"। এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"এখন সাধ্য নির্ণীত হল বটে, কিন্তু তার থেকেও অধিক যা আছে, তা বল"। তখন রামানন্দ রায় বললেন—"প্রেমভক্তি হচ্ছে সর্বসাধ্যসার"। এ পর্যন্ত শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"তাতে কি; কিন্তু তার পরেও যা আছে, তা বল"। তার উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন—"দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার"।

প্রশ্ন-৪১। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

প্রভু কহে,—"এহো হয়, কিছু আগে আর"।

রায় কহে,—"সখ্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার"।। (৮-৭৪)

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর"।

রায় কহে, "বাৎসল্য-প্রেম—সর্বসাধ্যসার"।। (৮-৭৬)

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর"।

রায় কহে, "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার"।। (৮-৭৯)

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয়।। (৮-৮২)

কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্বোত্তম।

তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম।। (৮-৮৩)

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ।। (৮-৮৪)

পূর্ব-পূর্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয়।

দুই-তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়।। (৮-৮৫)

শ্লোকার্থঃ এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—"আর কিছু আগে যেতে পারলে সর্বসার মিলবে"! রামানন্দ রায় তার উত্তরে বললেন—"শ্রীকৃষ্ণে 'সখ্যপ্রেম'ই সর্বসাধ্য সার"। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্মসুখরূপ উপলব্ধি করেন, দাস্যরসের ভক্তরা যাঁকে পরদেবতারূপে দর্শন করেন এবং মায়াশ্রিতা সাধারণ মানুষেরা যাকে একটি মানব শিশুরূপে দর্শন করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপ-বালকেরা জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জিভূত পুণ্য কর্মের ফলে, সখারূপে খেলা করছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—'সখ্যরস', 'দাস্যরস' থেকে উত্তম ঠিকই, কিন্তু আর একটু অগ্রগামী হ'লে সাধ্যসার পাওয়া যাবে। তার উত্তরে রামানন্দ রায় বললেন—"বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার"। মহাপ্রভু বললেন—"তোমার এই বর্ণনা উত্তরোত্তর উত্তম হয়েছে ঠিকই, তবুও একেও অতিক্রম করে আর যা আছে তা বল"। তখন রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'কান্তাভাব'ই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার"। কৃষ্ণ প্রেমের বহুবিধ উপায় আছে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ তারতম্যও রয়েছে। কিন্তু যার যেই রস সেইটিই সর্বোত্তম। তটস্থ হয়ে বিচার করলে তার তারতম্য বোঝা যায়। রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন স্তরে আস্বাদিত হয়। সেই রতি ক্রমে ক্রমে চরম স্তরে পরম আস্বাদনীয় মধুর রসরূপে প্রকাশিত হয়। পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরবর্তী রসগুলিতে বর্তমান। দুই, তারপর তিন, এইভাবে গণনা করে পাঁচ পর্যন্ত তা বর্ধিত হয়।

প্রশ্ন-৪২। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে।। (৮-৮৬)
আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে।
দুই-তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।। (৮-৮৭)
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে।। (৮-৮৮)
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। (৮-৯০)
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।। (৮-৯১)
এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয় কহে ভাগবতে।। (৮-৯২)
যদ্যপি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য-মাধুর্যের ধুর্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য।। (৮-৯৪)
প্রভু কহে, এই—'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয়।
কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয়।। (৮-৯৬)
ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম 'সাধ্যশিরোমণি'।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।। (৮-৯৮)

শ্লোকার্থঃ প্রতি রসে গুণের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেরও আধিক্য বর্ধিত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে প্রকাশিত হয়। "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটি এই পঞ্চ মহাভূতের গুণ যেমন এক, দুই, তিন ক'রে, ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে ভূমিতে যেরূপ পাঁচটি গুণই পূর্ণরূপে দেখা যায় ঠিক সেরূপ। এই ভগবৎ-প্রেম থেকেই অর্থাৎ বিশেষ ক'রে মাধুর্য-প্রেম থেকেই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের বশ। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁকে যেভাবে ভজনা করবেন, তিনিও তাকে সেইভাবে ভজন করবেন। ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান বলেছেন—যারা যেভাবে আমাকে প্রপত্তি করে—সেইভাবে আমি তাদের পুরস্কৃত করি। হে পার্থ সকলেই আমার পথ অনুসরণ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২২) বলা হয়েছে যে, মাধুর্য রসে যে কৃষ্ণপ্রেম, তার প্রতিদান শ্রীকৃষ্ণ যথাযথভাবে দিতে পারেন না, তাই তিনি সেই ধরনের ভক্তদের কাছে ঋণী থেকে যান। যদিও শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য—তাঁর মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা, তবুও ব্রজদেবীর সঙ্গ হলে সেই মাধুর্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি পায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "এটি অবশ্যই সাধ্য তত্ত্বের অবধি, তবুও যদি আরও কিছু থাকে, তা বল"। রামানন্দ রায় বললেন, ব্রজগোপিকাদের প্রেমের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম 'সাধ্য শিরোমণি', যাঁর মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৪৩। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণুরত্যন্তবল্লভা।। (৮-৯৯)
(এই শ্লোকটি পদ্মপুরাণে লেখা আছে)

প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে।। (৮-১০১)
চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে।। (৮-১০২)
রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি,—রাধাকৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ।। (৮-১০৩)
রায় কহে,—তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা।। (৮-১০৪)
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া।। (৮-১০৫)
(শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত গীত গোবিন্দঃ ৩/১-২ লেখা চৈ.চ. দেখ)
এই দুই-শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি।। (৮-১০৮)
শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্যে রহে রাধা-পাশ।। (৮-১০৯)
সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্বত্র 'সমতা'।
রাধার কুটিল-প্রেমে হইল 'বামতা'।। (৮-১১০)
অহেরিব গতিঃ প্রেমণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি।। (৮-১১১)

শ্লোকার্থঃ "শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁর কুণ্ড রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তেমনই প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা"। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—এরও আগের কথা বল। তোমার এই কথা শুনে আমি অত্যন্ত সুখ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তোমার মুখ থেকে এক অপূর্ব অমৃতের নদী প্রবাহিত হচ্ছে। রাসনৃত্যের সময়, অন্যান্য গোপিকাদের উপস্থিতি থাকায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে প্রেম বিনিময় করেননি। কেননা অন্যের অপেক্ষা থাকায় তাঁদের প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশিত হয়নি, তাই তিনি তাঁকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যান্য গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ অত্যন্ত গভীর। রামানন্দ রায় বললেন—তাহলে শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের মহিমা শ্রবণ করুন। ত্রিজগতে রাধারাণীর প্রেমের উপমা নেই। কৃষ্ণ তাঁকে অন্যান্য গোপিকাদের সমতুল্যা বলে গণ্য করেছেন বলে, শ্রীমতী রাধারাণী এক সময় রাসমণ্ডলী ছেড়ে চলে যান। তখন শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহে অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ করতে করতে বনে বনে তাঁর অন্বেষণ করেছিলেন। এই দুটি শ্লোকের অর্থ বিচার করলে বোঝা যায় যে, এই ধরনের উচ্চারণে কি অমৃত রয়েছে! তা বিচার করলে যেন অমৃতের খনির দ্বার উন্মুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও শতকোটি গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্য-বিলাস করছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এক মূর্তিতে তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে তাদের মাঝখানে বিরাজ করছিলেন। সাধারণ প্রেমে সর্বত্র সমতা দেখা যায়। কিন্তু রাধারাণীর কুটিল প্রেমে 'বামতা' বা বিরুদ্ধভাব প্রকাশ পেল। সর্পের মতোই প্রেমের স্বভাব-কুটিল গতি। সেইজন্য যুবক-যুবতীর মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুই প্রকার মানের উদয় হয়। রাসনৃত্যের সময় দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্তি কৃষ্ণ ছিলেন।

প্রশ্ন-৪৪। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল শ্রীহরি।। (৮-১১২)
সম্যক্সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।। (৮-১১৩)
তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে।। (৮-১১৪)
ইতস্ততঃ ভ্রমি' কাহাঁ রাধা না পাঞা।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা।। (৮-১১৫)
শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।। (৮-১১৬)

প্রভু কহে—যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে।। (৮-১১৭)
এবে সে জানিলু সাধ্য-সাধন-নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয়।। (৮-১১৮)
'কৃষ্ণের স্বরূপ' কহ 'রাধার স্বরূপ'।
'রস' কোন্ তত্ত্ব, 'প্রেম'—কোন্ তত্ত্বরূপ।। (৮-১১৯)
কৃপা করি' এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে।
তোমা-বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে।। (৮-১২০)
রায় কহে,—ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি আমি বাণী।। (৮-১২১)
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট।। (৮-১২২)

শ্লোকার্থঃ শ্রীমতী রাধারাণী যখন অভিমান ক'রে রাস ছেড়ে চলে গেলেন, তখন তাঁকে না দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পরিপূর্ণ এবং তাঁর বাসনার সারভূত প্রকাশ হচ্ছে রাসলীলা, এবং সেই রাসলীলার বাসনাতে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সংযোগ-স্থাপনকারী শৃঙ্খলা; তাঁকে ছাড়া রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে উজ্জ্বল আনন্দের সঞ্চার করে না। তাই তিনি রাসমণ্ডলী ছেড়ে তাঁর অন্বেষণ করতে গেলেন। ইতস্তত ভ্রমণ ক'রে কোথাও শ্রীমতী রাধারাণীকে না পেয়ে, অনঙ্গের বাণে খিন্ন হয়ে তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন। শতকোটি গোপীতেও শ্রীকৃষ্ণের কাম নির্বাপিত হল না, তা থেকেই শ্রীমতী রাধারাণীর অপ্রাকৃত গুণ অনুমান করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে বললেন—যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, সেই সমস্ত তত্ত্ববস্তু আমার জানা হল। এখন আমি জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তা লাভের পন্থা জানতে পারলাম। কিন্তু তবুও, আমার মনে হয় যে, তারও আগে হয়তো আরও কিছু আছে, তা শুনতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি আমাকে কৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে বল। রস কোন্ তত্ত্ব, আর রূপই বা কোন্ তত্ত্ব, তাও তুমি আমাকে বিশ্লেষণ ক'রে শোনাও। কৃপা ক'রে এই তত্ত্ব তুমি আমাকে শোনাও। তুমি ছাড়া আর কেউই এই তত্ত্ব নিরূপণ করতে সক্ষম নয়। শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আপনি আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন, আমি তাই বলছি। শুক পাখীর মতো আমি আপনার শেখানো বুলি আবৃত্তি করছি। আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার নাট্যাভিনয় কে বুঝতে পারে? আত্মা অভিমান শূণ্য হ'লে কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়।

প্রশ্ন-৪৫। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়।। (৮-১২৮)
বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।। (৮-১৩৮)
আপন-মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।। (৮-১৪৮)
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সবার উপরে।। (৮-১৫২)
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ।। (৮-১৫৪)
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী।। (৮-১৬০)
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরিয়সী।। (৮-১৬১)
(উজ্জ্বল নীলমণিঃ ৪/৩ শ্লোকে লেখা আছে)
'মহাভাব-চিন্তামণি' রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ।। (৮-১৬৫)

শ্লোকার্থঃ যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই 'গুরু', তা তিনি ব্রাহ্মণ হোন, কিংবা সন্ন্যাসীই হোন অথবা শূদ্রই হোন, তাতে কিছু যায় আসে না। বর্ণাশ্রমের চেয়ে কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। চিন্ময় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী এবং কামবীজ দ্বারা তাঁর উপাসনা হয়। 'ওঁ--নমো ভগবতে বাসুদেবায়'। 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহাঃ'। 'ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে

পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ'। কামদেব বা মদনমোহন কৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্বের অধিদেবতা, পুষ্প-বাণ বা গোবিন্দই অভিধেয়তত্ত্বের দেবতা এবং অনঙ্গ গোপীজনবল্লভ হ'য়ে প্রয়োজন তত্ত্বের অধিদেবতা। এগুলি কামগায়ত্রী বা কামবীজ মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এমনই মনোহর যে, তা তাঁর নিজের মনও হরণ করে এবং তিনি নিজে নিজেকে আলিঙ্গন করতে চান। কৃষ্ণের প্রধান তিনটি শক্তি—'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা' এবং 'তটস্থা' বলা হয়। তার মধ্যে অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সর্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সৎ (ব্রহ্মজ্যোতি), চিৎ (প্রাণ আছে) এবং আনন্দময় (আনন্দঘন) বিগ্রহ; তাই তাঁর স্বরূপশক্তি তিন প্রকার। হ্লাদিনীর (রাধার) ক্রিয়ার নাম 'প্রেম'। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী, তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্বাধিকা। প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' এবং সেই মহাভাবরূপা হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। (রাধারাণী এবং চন্দ্রাবলী) এই দুজন গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাব স্বরূপিনী এবং সমস্ত গুণে বরিয়সী। (এটি উ.নী ৪/৩ শ্লোক)। মহাভাবরূপ চিন্তামণি শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ। ললিতা, বিশাখা আদি সখীগণ তাঁর কায়ব্যূহ স্বরূপ।

প্রশ্ন-৪৬। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

মধ্যবয়স, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ।। (৮-১৭৭)
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম।। (৮-১৮০)
প্রভু কহে, জানিলুঁ কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দুহার বিলাস-মহত্ত্ব।। (৮-১৮৬)
রায় কহে,— কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত'।
নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত।। (৮-১৮৭)
রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে।। (৮-১৮৯)
প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে,—ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর।। (৮-১৯১)
রায় কহে,—যেই কহাও, সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি।। (৮-১৯৮)
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।। (৮-২০২)
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয়।। (৮-২০৩)

শ্লোকার্থঃ মধ্যবয়সের কিশোরী ভাবই সখী-স্কন্ধে করন্যাস এবং নিকটবর্তিনী সখীরা কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তিরূপা। কৃষ্ণলীলানন্দরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর অষ্ট মনোবৃত্তি অষ্ট সখী এবং তাঁর অনুবৃত্তিসমূহ গোপীদের সহকারী অন্যান্য মঞ্জরীগণ। শ্রীমতী রাধারাণী শৃঙ্গাররসরূপ মধু শ্রীকৃষ্ণকে পান করান। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—'আমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব জানতে পারলাম। এখন আমি তাদের বিলাস মহত্ত্ব জানতে চাই'। রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ 'ধীর-ললিত' নায়ক, কেন না তিনি সর্বদাই তাঁর প্রেয়সীদের প্রেমের দ্বারা বশীভূত। নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রাত্রি-দিন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুঞ্জে শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর কৈশোর বয়স সফল করেছিলেন—শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে বিবিধ লীলাবিলাস করার মাধ্যমে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন—তুমি যে 'সাধ্য' নির্ণয় করলে তা ঠিকই। কিন্তু তার পরে কি আছে, তা বল। তখন রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন—এর ঊর্ধ্বে যাওয়ার ক্ষমতা ও বুদ্ধি আমার নেই। আপনি আমাকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন, আমি তাই বলছি। যা বলছি তা ভাল না মন্দ সেই ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না। একমাত্র সখীগণের এই লীলায় অধিকার রয়েছে, এবং এই সখীদের থেকেই এই লীলার বিস্তার হয়। সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট হয় না। সখীরা এই লীলা বিস্তার ক'রে তাঁরা নিজেরাই তা আস্বাদন করেন। বৃন্দাবনে বাস ক'রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজ-গোপীকাদের লীলা বিলাসের কথা শ্রবণ করতে হবে। কখনো নিজেকে গোপী ব'লে মনে করা উচিত নয়, কেননা তা একটি মস্ত বড় অপরাধ। এই অপরাধের ফলে সে ধ্বংস হবে।

প্রশ্ন-৪৭। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন ।
কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন।। (৮-২০৭)
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়।। (৮-২০৮)

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা।। (৮-২০৯)
কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ-সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি-সুখ হয়।। (৮-২১০)
সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম'-নাম।। (৮-২১৫)
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।। (৮-২২২)
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।। (৮-২২৩)
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।। (৮-২২৮)
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।। (৮-২২৯)
গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।। (৮-২৩০)
তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। (৮-২৩১)

শ্লোকার্থঃ সখীদের স্বভাবে এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে—তারা নিজেরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে চান না। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার লীলা সম্পাদন করিয়ে তারা নিজ সুখ থেকে কোটি গুণ বেশী সুখ আস্বাদন করেন। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা-স্বরূপ, এবং সখীরা সেই লতার পল্লব, পুষ্প এবং পাতা। কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত যখন সেই লতায় সিঞ্চন করা হয়, তখন পল্লবাদির নিজ সুখ থেকে কোটিগুণ বেশী সুখ পায়। গোপীদের কৃষ্ণকে ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এই প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু জড় কামক্রীড়ার সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে বলে, তাকে কখনও কখনও 'কাম' বলে বর্ণনা করা হয়। ভক্তির উন্নত অবস্থায় ভক্ত কোনো বিশেষ ভাব নিয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। ভাবযোগ্য দেহ পেয়ে তিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—বেদ এবং উপনিষদ-বেত্তাগণ, যারা রাগমার্গে ভজনা ক'রে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। তাই গোপীভাব অঙ্গীকার ক'রে সর্বক্ষণ রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা চিন্তা করা উচিত। এইভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা চিন্তা করার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সিদ্ধদেহ লাভ করা যায়, এবং সখীভাব প্রাপ্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণসেবা লাভ করা যায়। ব্রজগোপিকাদের আনুগত্য বিনা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা লাভ করা যায় না। ভগবানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যারা অত্যধিক সচেতন, তারা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকলেও, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করতে পারেন না। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে-লক্ষ্মীদেবী ব্রজলীলায় প্রবেশ করার বাসনায় কৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ঐশ্বর্যপর ভাবের জন্য তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পান নি।

প্রশ্ন-৪৮। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার"?
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর"।। (৮-২৪৫)
'কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি'?
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি'।। (৮-২৪৬)
'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি'?
'রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী'।। (৮-২৪৭)
'দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর'?
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর'।। (৮-২৪৮)
'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি'?
'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি'।। (৮-২৪৯)
'গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম'?
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি'—যেই গীতের মর্ম।। (৮-২৫০)

'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার'?
'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর'।। (৮-২৫১)
'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ'?
'কৃষ্ণ'-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ'।। (৮-২৫২)
'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান'?
'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান'।। (৮-২৫৩)
'সর্ব ত্যজি' জীবের কর্তব্য কাহাঁ বাস'?
'ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহা লীলারাস'।। (৮-২৫৪)
'শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ'?
'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন'।। (৮-২৫৫)
'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান'?
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম'।। (৮-২৫৬)

শ্লোকার্থঃ মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার"? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন্ বিদ্যা নেই"। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন,'সমস্ত কীর্তির মধ্যে কোন্ কীর্তি শ্রেষ্ঠ'? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'কৃষ্ণভক্ত বলে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনিই সবচাইতে বড় কীর্তিমান'। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'জীবের সম্পত্তির মধ্যে কোন্ সম্পত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ'? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'রাধাকৃষ্ণে যাঁর প্রেম, তিনিই সবচাইতে ধনী'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত দুঃখের মধ্যে কোন্ দুঃখ সবচাইতে গুরুতর'? শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ থেকে অধিক গুরুতর দুঃখ আমি আর দেখি না'। মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত মুক্তদের মধ্যে কোন্ জীব মুক্তশ্রেষ্ঠ'? রায় তখন উত্তর দিলেন, 'যিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন, তিনিই মুক্ত-শিরোমণি'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত গানের মধ্যে কোন্ গান জীবের প্রকৃত ধর্ম'? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'যে গান রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলী বর্ণনা করে, সেই গানই সর্বশ্রেষ্ঠ'। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত মঙ্গলজনক এবং শুভকার্যের মধ্যে কোনটি জীবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ'? রায় উত্তর দিলেন, 'জীবের একমাত্র শ্রেয় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করা, এছাড়া আর কোন্ শ্রেয় নেই'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'জীব সর্বক্ষণ কার কথা স্মরণ করবে'? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি স্মরণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ'। মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব রকমের ধ্যানের মধ্যে কিসের ধ্যান করা জীবের কর্তব্য'? শ্রীল রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'রাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করাই জীবের প্রধান কর্তব্য'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবকিছু ত্যাগ ক'রে কোথায় বাস করা জীবের কর্তব্য'? রায় উত্তর দিলেন, 'ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যেখানে ভগবান তাঁর রাসলীলা-বিলাস করেছিলেন। সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়টি জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ'? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি শ্রবণই কর্ণের সবচাইতে আনন্দদায়ক বিষয়'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্ত উপাস্য বস্তুর মধ্যে কোন্ উপাস্য বস্তুটি প্রধান'? রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, 'রাধাকৃষ্ণ' নাম, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শ্রেষ্ঠ উপাস্য'।

প্রশ্ন-৪৯। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।। (৮-২৫৮)
এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।। (৮-২৬৭)
পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।। (৮-২৬৮)
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।। (৮-২৬৯)
তাহাতে প্রকট দেখোঁ স-বংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন।। (৮-২৭০)
এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার।। (৮-২৭১)
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়।। (৮-২৭৭)

রায় কহে,—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।। (৮-২৭৮)
রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।। (৮-২৭৯)
নিজ-গুঢ়কার্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।। (৮-২৮০)
তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ।। (৮-২৮২)

শ্লোকার্থঃ রামানন্দ রায় বললেন, 'মুক্তিকামী জ্ঞানীরা অরসজ্ঞ, তারা কর্কশ তর্কনিষ্ঠ কাকের মতো, কাক যেমন তিক্ত নিম্ব ফল খায়, তারাও তেমনই শুষ্ক নীরস জ্ঞানের চর্চা করে। কিন্তু যারা রসজ্ঞ, তারা কোকিলের মতো; তারা কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্র-মুকুলের প্রিয় ও সুমিষ্ট রস আস্বাদন করেন'। রামানন্দ রায় বললেন, 'আমার হৃদয়ে একটি সংশয় উদিত হয়েছে, কৃপা ক'রে সেই সংশয়টি আপনি দূর করুন। প্রথমে আমি আপনাকে সন্ন্যাসীরূপে দর্শন করেছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনাকে শ্যামসুন্দর গোপবালকরূপে দর্শন করছি। আপনার সামনে দেখছি একটি সুবর্ণ প্রতিমা, এবং তার উজ্জ্বল গৌরকান্তি দিয়ে আপনার সর্বঅঙ্গ ঢাকা। তাঁর সেই রূপে তাঁর মুখে বাঁশী এবং নানাভাবের আবেশে তাঁর কমল-সদৃশ নয়ন যুগল চঞ্চল। এইভাবে আপনাকে দর্শন ক'রে আমার হৃদয় চমৎকৃত হয়েছে। হে প্রভু, অকপটে আপনি আমাকে তার কারণ বলুন'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন,—রাধাকৃষ্ণে তোমার গভীর প্রেম, তাই তুমি সর্বত্রই রাধাকৃষ্ণকেই দর্শন কর। রামানন্দ রায় বললেন, 'হে প্রভু, দয়া ক'রে কথার ছলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না এবং আপনার স্বরূপ আমার কাছে লুকোবেন না। শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং অঙ্গকান্তি নিয়ে আপনি আপনার নিজের রস আস্বাদন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার একটি নিগূঢ় কারণ রয়েছে—সেই কারণটি হচ্ছে আপনার নিজের প্রেম-আস্বাদন করা। আর তার আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনি সারা জগৎকে প্রেমময় করেছেন'। তখন মৃদু হেসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর স্বরূপ দেখালেন। রাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব —কৃষ্ণ এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর হ্লাদিনী শক্তি প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দুজন ব'লে মনে হয়--রাধা এবং কৃষ্ণ। তা না হলে, রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েই এক।

প্রশ্ন-৫০। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে।। (৮-২৮৩)
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি' করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেষ দেখি' বিস্মিত হৈল মন।। (৮-২৮৪)
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইলুঁ তোমারে।। (৮-২৮৬)
গৌর অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।। (৮-২৮৭)
তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ-মাধুর্য করি আস্বাদন।। (৮-২৮৮)
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্বমর্ম।। (৮-২৮৯)
গুপ্তে রাখিহ, কাহাঁ না করিও প্রকাশ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস।। (৮-২৯০)
আমি—এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয়—বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।। (৮-২৯১)
নিগুঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল, তার না পাইল পার।। (৮-২৯৩)
তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি।
কেহ যদি কাহাঁ পোতা পায় একখানি।। (৮-২৯৪)
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায়।। (৮-২৯৫)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন ক'রে রামানন্দ রায় আনন্দে মূর্চ্ছিত হলেন এবং স্থির থাকতে না পেরে তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন। মহাপ্রভু তখন তাঁর হস্ত স্পর্শ ক'রে—তার চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীর বেশ দেখে রামানন্দ রায় বিস্মিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'আমার লীলার তত্ত্ব, আমার রসের তত্ত্ব, সবই তুমি জান। তাই আমি তোমাকে আমার এই রূপ দেখালাম। আমার অঙ্গ গৌর নয়, শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গের স্পর্শে তা এই বর্ণ ধারণ করেছে। ব্রজেন্দ্রনন্দন ছাড়া তিনি অন্য কাউকে স্পর্শ করেন না। তাঁর ভাবে আমার আত্মা এবং মনকে ভাবিত ক'রে আমি এইভাবে আমার মাধুর্য আস্বাদন করছি'। মহাপ্রভু তখন তাঁর শুদ্ধভক্ত রামানন্দ রায়ের কাছে স্বীকার করলেন, "তোমার কাছে আমার কোনো কিছুই গোপনীয় নয়। যদিও আমি আমার কার্যকলাপ লুকোতে চাই, তবুও তোমার প্রেমের বলে তুমি সবকিছু জেনে ফেল। এই সমস্ত কথা গোপন রেখ, কারও কাছে প্রকাশ ক'র না। যেহেতু আমার সমস্ত কার্যকলাপ লোকের কাছে উন্মাদের মতো ব'লে মনে হয়, তাই লোকে উপহাস করতে পারে। আমি এক উন্মাদ, আর তুমি দ্বিতীয় উন্মাদ। তাই আমরা দুজনেই সমান"। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য লীলার নিগুঢ় তত্ত্ব বিচার করলেন। যদিও তাঁরা অনেক আলোচনা করলেন, তবুও তার অন্ত খুঁজে পেলেন না। এই আলোচনা তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা এবং চিন্তামণির খনির মতো। কেউ যদি কোথাও পোতা অবস্থায় তার একটিও পায়, তাহলে ক্রমে ক্রমে সেগুলি উঠাতে থাকলে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর বস্তু লাভ করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের প্রশ্নোত্তর ঠিক তেমনই হয়েছিল।

প্রশ্ন-৫১। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ।। (৯-১)
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন।। (৯-৩)
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, পাষণ্ডী অপার।। (৯-৯)
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে।। (৯-১০)
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহ 'তত্ত্ববাদী', কেহ হয় 'শ্রীবৈষ্ণব'।। (৯-১১)
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে।। (৯-১২)
রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন।
তাহা এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।। (৯-১৮)
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয়।। (৯-১৯)
সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি'।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি।। (৯-২০)
স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্ধ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা, তাঁহা দেখি' ত্রিবিক্রম।। (৯-২১)

শ্লোকার্থঃ বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদ আদি বহুবিধ মতরূপ কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্ররূপ দাক্ষিণাত্যবাসীদের তাঁর কৃপাচক্র দ্বারা উদ্ধার ক'রে শ্রীগৌরচন্দ্র তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভারত গমন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কেননা তিনি সেখানে সহস্র সহস্র তীর্থ দর্শন করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ ছিল। তাদের কেউ জ্ঞানী, কেউ সকাম কর্মী, এইরকম অগণিত পাষণ্ডী সেখানে ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনের প্রভাবে সেই সমস্ত লোকেরা তাদের নিজ নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব হলেন। সেই সময় দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ ছিলেন রাম-উপাসক, কেউ তত্ত্ববাদী, কেউ শ্রী-বৈষ্ণব। সেই সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন ক'রে কৃষ্ণোপাসক হলেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে লাগলেন। তিনি রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন ক'রে তাঁকে প্রণতি এবং স্তব করলেন। তখন এক বিপ্র মধ্যাহ্নে তার গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেই ব্রাহ্মণটি নিরন্তর রামচন্দ্রের দিব্যনাম উচ্চারণ করতেন। রামনাম ছাড়া তিনি অন্য কোনো নাম বলতেন না। সেইদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার ঘরে রইলেন এবং তার কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করলেন। এইভাবে তাকে কৃপা ক'রে শ্রীগৌরহরি এগিয়ে চললেন।

প্রশ্ন-৫২। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে।। (৯-২২)
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
"কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল।। (৯-২৩)
পূর্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম ।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম"।। (৯-২৪)
বিপ্র বলে,—এই তোমার দর্শন-প্রভাবে।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম স্বভাবে।। (৯-২৫)
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার।। (৯-২৬)
সেই হইতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা।। (৯-২৭)
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়।। (৯-২৮)
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল।। (৯-৩৬)
তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগমন।। (৯-৪২)
নিজ-নিজ-শাস্ত্রোগ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড।। (৯-৪৩)
সর্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে।। (৯-৪৪)

শ্লোকার্থঃ ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সিদ্ধবটে সেই বিপ্রের ঘরে আবার ফিরে এলেন। তখন সেখানে তিনি দেখলেন যে, সেই বিপ্র নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করছেন। সেখানে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে বিপ্র, তোমার এই দশা কিভাবে হল? আগে তো তুমি সবসময় রামনাম নিতে, এখন কেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করছ'? সেই বিপ্র তখন উত্তর দিলেন,—তোমার দর্শনের প্রভাবেই তা হয়েছে। তোমাকে দেখামাত্র আমার আজন্মের স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাল্যকাল থেকেই আমি রামনাম গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মুখে একবার কৃষ্ণনাম এল। সেই থেকে আমার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম হতে লাগল এবং রামনাম দূরে গেল। ছোটবেলা থেকেই আমার একটা স্বভাব এই যে, আমি নামের মহিমা শাস্ত্র-সংগ্রহ করি। তোমাকে দর্শন ক'রে যখন আমার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম স্ফূরিত হ'ল, তখন আমার হৃদয়ে কৃষ্ণনামের মহিমা প্রকাশিত হ'ল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'বৃদ্ধকাশী' ত্যাগ ক'রে এক গ্রামে এলেন। সেখানে, কেউ তার্কিক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, কেউ মীমাংসক, কেউ কপিলের সাংখ্য দার্শনিক, কেউ অষ্টাঙ্গযোগী। কেউ স্মৃতি-শাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনুগামী দার্শনিক ছিলেন। তারা সকলেই তাদের নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্ত মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন ক'রে তাদের সিদ্ধান্তকে খণ্ড খণ্ড করলেন। বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্ম-সূত্র এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত কেউ খণ্ডন করতে পারল না।

প্রশ্ন-৫৩। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এই মতে 'বৈষ্ণব' প্রভু কৈল দক্ষিণ দেশ।। (৯-৪৫)
পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা।। (৯-৪৬)
বৌদ্ধাচার্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে।। (৯-৪৭)
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব খণ্ডাইতে।। (৯-৪৮)

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে'।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে।। (৯-৪৯)
বৌদ্ধাচার্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল।। (৯-৫০)
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয়।। (৯-৫১)
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল।। (৯-৫২)
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া।
প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া।। (৯-৫৩)
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি' অন্নসহ থালি লঞা গেল।। (৯-৫৪)
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হৈঞা।
বৌদ্ধাচার্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া।। (৯-৫৫)
তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি' গেল।
মূর্ছিত হঞা আচার্য ভূমিতে পড়িল।। (৯-৫৬)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক পরাজিত হয়ে এই সমস্ত দার্শনিক এবং তাদের অনুগামীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র দক্ষিণ-ভারতকে বৈষ্ণবে পরিণত করলেন। মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে পাষণ্ডীরা তাদের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে সেখানে এলেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ-আচার্য। তাদের 'নবমত' প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তারা তর্কের অবতারণা করলেন। যদিও বৌদ্ধরা বেদ-বিরোধী ব'লে সম্ভাষণের যোগ্য নয়, এবং তারা নিরীশ্বরবাদী ব'লে তাদের দর্শন করা উচিত নয়, তবুও তাদের মত খণ্ডন করার জন্য মহাপ্রভু তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্র তর্ক-প্রধান এবং তার 'নবমত' নামক নয়টি সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের যুক্তির দ্বারাই তাদের মত খণ্ডন করলেন। তারা আর তাদের মত স্থাপন করতে পারলেন না। বৌদ্ধাচার্য 'নব প্রশ্ন'-এর সবকটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ় যুক্তির দ্বারা সেগুলি খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ফেললেন। সেই সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিক এবং পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পরাজিত হলেন। তা দেখে লোকেরা হাসতে লাগল এবং বৌদ্ধরা লজ্জিত হ'ল ও ভয় পেল। সেই বৌদ্ধরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন বৈষ্ণব। তারা সকলে অত্যন্ত বিষন্নচিত্তে ঘরে ফিরে গেলেন, এবং সেখানে সকলে মিলে তারা এক কুমন্ত্রণা করলেন। একটি থালায় অপবিত্র অন্ন নিয়ে তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে, মহাপ্রসাদ ব'লে তাঁকে দিলেন। সেই সময় এক বিশালকায় পক্ষী সেখানে এসে ঠোঁটে ক'রে অন্নসহ সেই থালিটি নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। সেই অমেধ্য অন্ন সমস্ত বৌদ্ধদের মাথার উপরে পড়ল, এবং সেই থালাটি বৌদ্ধাচার্যের মাথার উপরে পড়ল। তার মাথার উপরে থালাটি পড়ায় এক প্রচণ্ড শব্দ হ'ল। তেরছাভাবে পড়ার ফলে তার ফলে তার মাথা কেটে গেল। বৌদ্ধাচার্য মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়লেন।

প্রশ্ন-৫৪। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ।। (৯-৫৭)
তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ।। (৯-৫৮)
প্রভু কহে,—সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি'।। (৯-৫৯)
তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।। (৯-৬০)
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য বলে 'হরি' 'হরি'।। (৯-৬১)
কৃষ্ণ বলি' আচার্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময়।। (৯-৬২)
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ।। (৯-৯১)

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্তন।। (৯-৯৩)
মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে, শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয়।। (৯-৯৭)
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর।। (৯-৯৯)
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ।। (৯-১০০)
যাবৎ পড়ো, তাবৎ পাও তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন।। (৯-১০১)
প্রভু কহে,— গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার।। (৯-১০২)

শ্লোকার্থঃ বৌদ্ধাচার্যের সমস্ত শিষ্যেরা তখন হাহাকার ক'রে ক্রন্দন করতে লাগলেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলেন। তারা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা ক'রে বললেন, 'আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাদের সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। কৃপা ক'রে আপনি আমাদের গুরুকে পুনরুজ্জীবিত করুন'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাদের বললেন, তোমরা সকলে বল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' এবং উচ্চৈঃস্বরে তোমাদের গুরুর কর্ণেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। তাহলে তোমাদের 'গুরু' চেতনা ফিরে পাবেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে তখন সমস্ত বৌদ্ধরা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। সেই বৌদ্ধাচার্যের শিষ্যারা তখন তার কর্ণে কৃষ্ণ, রাম, হরি, ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, এবং তার ফলে তাদের আচার্য চেতনা ফিরে পেয়ে 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন। বৌদ্ধ আচার্য তখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে করতে অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হলেন। তা দেখে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বাস করতেন তারা সকলে একদিন ক'রে মহাপ্রভুকে তাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি প্রতিদিন দেবালয়ে এসে ভগবদ্গীতা পাঠ করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, ভগবদ্গীতার কোন্ অর্থ উপলব্ধি ক'রে আপনার এত আনন্দ হচ্ছে'? সেই ব্রাহ্মণ বললেন, 'যখনই আমি ভগবদ্গীতা পাঠ করি তখনই আমি দেখি, অর্জুনের রথের সারথি হয়ে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ হাতে ঘোড়ার রশি নিয়ে বসে আছেন এবং অর্জুনকে হিতোপদেশ দান করছেন। তাঁকে দেখা মাত্রই আমি আনন্দে আবিষ্ট হই, এবং যখনই আমি গীতা পড়ি, তখনই আমি তাঁকে দর্শন করি। সেই জন্যই আমার মন গীতা-পাঠ করার অভ্যাস ছাড়তে পারে না'। মহাপ্রভূ তখন সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, 'গীতাপাঠে তোমার যথার্থই অধিকার রয়েছে, এবং তুমিই গীতার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছ।

প্রশ্ন-৫৫। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

'শ্রী-বৈষ্ণব' ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।। (৯-১০৯)
প্রভু কহে, ভট্ট,—তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি।। (৯-১১১)
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম।। (৯-১১২)
ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ।। (৯-১১৫)
তার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম।। (৯-১১৬)
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস।। (৯-১১৮)
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস।। (৯-১১৯)
প্রভু কহে,—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি।। (৯-১২০)
লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ।। (৯-১২২)

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে,—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন।। (৯-১২৪)

শ্লোকার্থঃ রামানুজ-সম্প্রদায়ের 'শ্রীবৈষ্ণব' হওয়ার ফলে বেঙ্কটভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করতেন। তার শুদ্ধভক্তি দর্শন ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টকে বললেন, বেঙ্কটভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সর্বদাই নারায়ণের বক্ষস্থিতা এবং তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত পতিব্রতাদের শিরোমণি। আর আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপবালক, তিনি সারাদিন মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়ান। সাধ্বী হয়ে লক্ষ্মীদেবী কেন তাঁর সঙ্গ করতে চান? তার উত্তরে ব্যেঙ্কটভট্ট বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণ এক এবং অভিন্ন, কিন্তু বৈদগ্ধ্যাদি ভাব থাকায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা অধিক আস্বাদনীয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং নারায়ণ যেহেতু একই পরম পুরুষ, তাই শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে লক্ষ্মীর পতিব্রতা-ধর্ম নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, কৌতুকের ছলে লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী বিবেচনা করেছিলেন, 'কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম নাশ হয় না। অধিকন্তু, কৃষ্ণের সঙ্গ হ'লে রাসলীলা আস্বাদন করা যায়'। বেঙ্কটভট্ট আরও বললেন, লক্ষ্মীদেবী সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী, তিনিও অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভাব করেন; তাই তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে অভিলাষী হন, তাতে কি দোষ? কেন তা নিয়ে তুমি পরিহাস করছ? মহাপ্রভু বললেন, 'তাতে দোষ নেই, তা আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্রের বর্ণনায় আমি শুনেছি, লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। লক্ষ্মীদেবী কেন রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন না? অথচ মূর্তিমান শ্রুতিগণ তো তপশ্চর্যা ক'রে রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন? তার কারণ কি আপনি বলতে পারেন? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্রুতিগণ রাসলীলায় প্রবেশ করতে পারলেন অথচ লক্ষ্মীদেবী পারলেন না, এর কি কারণ'? তখন বেঙ্কটভট্ট বললেন—'সেই অচিন্ত্য রহস্য বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'।

প্রশ্ন-৫৬। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

প্রভু কহে,— কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ।। (৯-১২৭)
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন।। (৯-১২৮)
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে।। (৯-১২৯)
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন।। (৯-১৩০)
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।। (৯-১৩১)
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসূত ভজে গোপীভাব লঞা।। (৯-১৩৩)
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল।। (৯-১৩৪)
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার।। (৯-১৩৫)
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন।। (৯-১৩৬)
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস।। (৯-১৩৭)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ স্বভাব হচ্ছে যে, তিনি তাঁর মাধুর্যের দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন'। গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদদের আনুগত্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ করা যায়। সেই সমস্ত ব্রজবাসীরা জানেন না—শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সেখানে কেউ তাঁকে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁধেন, আবার কেউ সখা-জ্ঞানে, তাঁর সঙ্গে খেলায় জিতে, তাঁর কাঁধে চড়েন। ব্রজজনেরা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দমহারাজের পুত্র ব'লে জানেন, ঐশ্বর্যজ্ঞানে তাঁর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্রজবাসীদের ভাব অনুসারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পান। শ্রুতিগণ গোপীদের অনুগত হয়ে গোপীভাব অবলম্বন ক'রে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন। শ্রুতিগণ যখন ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ ক'রে বাহ্যে গোপীদেহ এবং অন্তরে গোপীভাব প্রাপ্ত হলেন, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাতিতে গোপ এবং গোপীরা হচ্ছেন তাঁর প্রেয়সী। শ্রীকৃষ্ণ কখনও স্বর্গের দেবী বা অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গ করেন না। লক্ষ্মীদেবী তাঁর সেই চিন্ময় দেহ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গোপিকাদের অনুগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেননি। গোপীদেহ ভিন্ন অন্য

কোনো দেহ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসবিলাস করা যায় না; তাই বেদব্যাস 'নায়ং সুখাপো ভগবান' শ্লোকটির মাধ্যমে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। রাসলীলায় প্রবেশ করতে হলে গোপীদের মতো চিন্ময়দেহ প্রাপ্ত হতে হবে। কৃত্রিমভাবে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় অনুকরণ ক'রে, অথবা নিজেকে কৃষ্ণ ব'লে মনে করে, অথবা সখী সেজে এবং পরস্ত্রীদের সখী সাজিয়ে নৃত্য ক'রে রাসলীলায় প্রবেশ করা যায় না। পরিণামে পরস্ত্রীদের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। যার ফলে সমাজ কলুষিত হয় এবং নরকে প্রবেশ করতে হয়।

প্রশ্ন-৫৭। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

পূর্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
'শ্রীনারায়ণ' হয়েন স্বয়ং-ভগবান্।। (৯-১৩৮)
তাঁহার ভজন সর্বোপরি-কক্ষা হয়।
'শ্রী-বৈষ্ণবে'র ভজন এই সর্বোপরি হয়।। (৯-১৩৯)
এই তাঁর গর্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন।। (৯-১৪০)
প্রভু কহে,—ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয়।
'স্বয়ং-ভগবান' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয়।। (৯-১৪১)
কৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন।। (৯-১৪২)
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ।। (৯-১৪৪)
স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ।। (৯-১৪৭)
'চতুর্ভুজ-মূর্তি' দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে।। (৯-১৪৯)
দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস।। (৯-১৫২)
এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।। (৯-১৫৫)
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে, মোরে কহিলে কৃপা করি'।। (৯-১৬১)
এত বলি' তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরসিত হঞা।। (৯-১৭৩)

শ্লোকার্থঃ পূর্বে ব্যেঙ্কটভট্টের মনে একটি অভিমান ছিল যে, 'শ্রীনারায়ণ' হলেন স্বয়ং ভগবান। তাই তিনি মনে করতেন যে নারায়ণের ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন, অতএব শ্রী-বৈষ্ণবের ভজন সর্বোত্তম। তার এই গর্ব খর্ব করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরিহাসের ছলে তাকে এই সমস্ত কথা বললেন। মহাপ্রভু তাকে বললেন, ব্যেঙ্কটভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান সেই সম্বন্ধে মনে কোনো সংশয় রেখো না। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি। তাই তিনি লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁর অনুগামীদের চিত্ত হরণ করেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের চারটি অসাধারণ গুণ রয়েছে, যা নারায়ণে নেই, তাই লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা সতৃষ্ণ থাকেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করেন, কিন্তু নারায়ণ গোপিকাদের মন হরণ করতে পারেন না। তা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়। চারটি অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণে আছে, তা নারায়ণে নেই। যথা-(১) লীলামাধুর্য, (২) প্রেমমাধুর্য, (৩) বেণুমাধুর্য ও (৪) রূপমাধুর্য, যা বিশ্ব-চরাচরকে মুগ্ধ করে। চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখে তাঁর প্রতি গোপিকাদের অনুরাগ হয়নি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম রস সমন্বিত গোপীকাদের ভাব সবচাইতে নিগুঢ় পারমার্থিক রহস্য। এইভাবে ব্যেঙ্কটভট্টের গর্ব খর্ব ক'রে তাকে সুখ দেওয়ার জন্য সেই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ক'রে তিনি ব্যেঙ্কটভট্টকে বললেন, 'তুমি মনে দুঃখ পেও না, এ সমস্ত কথা আমি তোমাকে পরিহাসছলে বললাম। এখন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শোন, যাতে বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন। ভক্তের আসক্তি অনুসারে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান একই, কিন্তু তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন'। ব্যেঙ্কটভট্ট বললেন, এখন আমি জানতে পারলাম যে, কৃষ্ণভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। সেই তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ ক'রে তুমি আমাকে কৃতার্থ করলে। ভক্তের আজ্ঞা নিয়ে মহাপ্রভু হরষিত হয়ে দক্ষিণে চললেন।

প্রশ্ন-৫৮। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে।। (৯-১৭৮)
প্রভু কহে,—বিপ্র কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ।। (৯-১৮৬)
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে,—ইহা কানে শুনি।। (৯-১৮৮)
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়।। (৯-১৮৯)
স্পর্শিবার কার্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ।। (৯-১৯২)
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল।। (৯-১৯৩)
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে।। (৯-১৯৫)
পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী।। (৯-২০১)
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ।। (৯-২০২)
'মায়াসীতা' রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে।। (৯-২০৩)
সীতা লঞা রাখিলেন পার্বতীর স্থানে।
'মায়াসীতা' দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে।। (৯-২০৪)
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল।। (৯-২০৫)
তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্ধান।
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান।। (৯-২০৬)

শ্লোকার্থঃ কামকোষ্ঠী থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-মথুরায় গেলেন, এবং সেখানে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন উপবাস করছেন? আপনি কেন এত দুঃখ করছেন? আপনি কেন এভাবে হা-হুতাশ করছেন'? 'সীতাদেবী সমগ্র জগতের মাতা, তিনি মহালক্ষ্মী, অথচ রাক্ষস রাবণ তাঁকে স্পর্শ করল এবং সেই কথা আমাকে কানে শুনতে হ'ল'। ইহা বলে সেই ব্রাহ্মণ আরো বললেন, এই দুঃখে আমার জীবন ধারণ করার বাসনা নেই। এই দুঃখে আমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে, অথচ এই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে না। মহাপ্রভু বললেন, তাঁকে স্পর্শ করা তো দূরে থাকুক, তাঁকে দর্শন পর্যন্ত কেউ করতে পারে না। সীতার মায়াময়ী আকৃতি রাবণ হরণ করেছিল। রাবণ আসা মাত্রই সীতাদেবী অন্তর্হিতা হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে রাবণকে প্রতারণা করার জন্য তিনি তাঁর মায়াময়ী রূপ প্রেরণ করেছিলেন। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন এবং আর কখনও এভাবে দুর্ভাবনা করবেন না। সীতাদেবী জগতের মাতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের গৃহিণী। তিনি পতিব্রতাদের শিরোমণি এবং মহারাজ জনকের দুহিতা। রাবণ যখন সীতাদেবীকে হরণ করতে আসে, তখন রাবণকে দেখে তিনি অগ্নিদেবের শরণ গ্রহণ করেন। অগ্নিদেব তখন সীতাদেবীকে আবৃত করেন, এবং এইভাবে তিনি রাবণের হাত থেকে সীতাদেবীকে রক্ষা করেছিলেন। কূর্ম পুরাণে রাবণের এইভাবে 'মায়াসীতা' হরণের উপাখ্যান শুনে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অগ্নিদেব সীতাদেবীকে নিয়ে পার্বতীর কাছে রাখলেন এবং 'মায়াসীতা' দিয়ে রাবণকে বঞ্চনা করলেন। শ্রীরামচন্দ্র এসে যখন রাবণকে বধ করলেন এবং অগ্নি-পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সীতাদেবীকে আনা হ'ল, তখন মায়াসীতাকে অন্তর্হিত ক'রে অগ্নিদেব রামচন্দ্রের কাছে প্রকৃত সীতাকে এনে দিলেন।

প্রশ্ন-৫৯। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

আম্‌লিতলায় দেখি' শ্রীরাম গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি।। (৯-২২৪)
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাহাঁ হৈল দরশন।। (৯-২২৬)

স্ত্রীধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল।

আর্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল।। (৯-২২৭)

প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে।

তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে।। (৯-২২৮)

আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে।

আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে।। (৯-২২৯)

শুনি সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা।

মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা।। (৯-২৩১)

তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।

খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে।। (৯-২৩২)

ভট্টথারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।

কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা করিল গমন।। (৯-২৩৩)

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে।

স্নান করি' গেল আদিকেশব-মন্দিরে।। (৯-২৩৪)

মহাভক্তগণসহ তাহাঁ গোষ্ঠী কৈল।

'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি তাহা পাইল।। (৯-২৩৭)

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম।

গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ।। (৯-২৩৯)

শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।

মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে।। (৯-২৪৪)

শ্লোকার্থঃ কন্যাকুমারী দর্শন ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আম্‌লিতলায় শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন। তারপর তিনি মল্লার দেশে যান, সেখানে ভট্টথারি নামক এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকেরা বাস করত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ-ভৃত্য ছিলেন। ভট্টথারিদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ভট্টথারিরা স্ত্রীধন দেখিয়ে সরল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের চিত্তে লোভ জন্মিয়ে তার বুদ্ধিনাশ করল। এইভাবে ভট্টথারিদের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে প্রাতঃকালে কৃষ্ণদাস তাদের কাছে আসে। তাকে খুঁজতে খুঁজতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শীঘ্র সেখানে এসে উপস্থিত হন। ভট্টথারিদের কাছে এসে মহাপ্রভু তাদের বলেন, তোমরা কেন আমার ব্রাহ্মণ সহকারীকে তোমাদের কাছে রেখে দিয়েছ? মহাপ্রভুর এই কথা শুনে সমস্ত ভট্টথারিরা অস্ত্র নিয়ে মারবার জন্য চারদিক থেকে ধেয়ে এল। কিন্তু তাদের অস্ত্র তাদের হাত থেকে পড়ে তাদেরই দেহকে আঘাত করতে লাগল। এইভাবে যখন কয়েকটি ভট্টথারির দেহ খণ্ড খণ্ড হ'ল, তখন অন্য সকলে চারদিকে পালাতে শুরু করল। তখন ভট্টথারিদের ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠল এবং মহাপ্রভু চুলে ধরে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেইদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পয়স্বিনী-নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন এবং নদীতে স্নান ক'রে আদিকেশবের মন্দিরে গেলেন। সেখানে মহাপ্রভু মহান ভক্তদের সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করলেন এবং সেখানে তিনি ব্রহ্ম-সংহিতার একটি অধ্যায় পেলেন। ব্রহ্ম-সংহিতার মতো সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আর নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই শাস্ত্রটি গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের চরম প্রকাশ। সেখানে তিনি শঙ্করাচার্যের স্থান শৃঙ্গেরি মঠে এলেন। তারপর মৎস্যতীর্থ দর্শন ক'রে তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান করলেন।

প্রশ্ন-৬০। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

মধ্বাচার্য-স্থানে আইলা যাঁহা 'তত্ত্ববাদী'।

উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি, তাহাঁ হৈল প্রেমোন্মাদী।। (৯-২৪৫)

নর্তক গোপাল দেখে পরম-মোহনে।

মধ্বাচার্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে।। (৯-২৪৬)

গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।

মধ্বাচার্য সেই কৃষ্ণ পাইলা কোনমতে।। (৯-২৪৭)

মধ্বাচার্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।

অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ।। (৯-২৪৮)

আচার্য কহে,—'বর্ণাশ্রম-ধর্ম, কৃষ্ণে সমর্পণ'।

এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন'।। (৯-২৫৬)

'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।

'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়—এই শাস্ত্র-নিরূপণ।। (৯-২৫৭)

প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম সাধন'।। (৯-২৫৮)
শ্রবণ-কীর্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা।। (৯-২৬১)
কর্মনিন্দা, কর্মত্যাগ, সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।। (৯-২৬৩)
মুক্তি, কর্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন'।। (৯-২৭১)
শুনি' তত্ত্বাচার্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি, হইলা বিস্মিত।। (৯-২৭৩)
আচার্য কহে,—তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়।
সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়।। (৯-২৭৪)
তথাপি মধ্বাচার্য যে করিয়াছে নির্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ।। (৯-২৭৫)

শ্লোকার্থঃ তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উডুপীতে শ্রীমধ্বাচার্যের স্থানে এলেন, যেখানে 'তত্ত্ববাদী' দার্শনিকেরা বাস করতেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন ক'রে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হয়েছিলেন। উডুপীতে মহাপ্রভু পরম সুন্দর 'নর্তক গোপাল' বিগ্রহ দর্শন করেন। এই বিগ্রহটি স্বপ্নে দেখা দিয়ে মধ্বাচার্যের কাছে এসেছিলেন। এই শ্রীবিগ্রহটি গোপীচন্দনে আবৃত হয়ে নৌকাতে ছিলেন এবং মধ্বাচার্য তাঁকে প্রাপ্ত হন। মধ্বাচার্য এই 'নর্তক গোপাল' বিগ্রহ উডুপীতে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববাদী নামক মধ্বাচার্যের অনুগামীরা আজও তাঁর সেবা ক'রে আসছেন। আচার্য তখন বললেন, বর্ণাশ্রমধর্ম অনুশীলন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে কর্মার্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন'। 'পাঁচ প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করাই 'শ্রেষ্ঠ সাধ্য'—এই তত্ত্বই শাস্ত্রে নিরূপিত হয়েছে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু বলা হয়েছে যে, শ্রবণ-কীর্তন আদি ভক্ত্যাঙ্গের অনুশীলনই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভের 'পরম সাধন'। শ্রবণ—কীর্তন আদি নবধা ভক্তি অনুশীলন করার ফলে যে 'কৃষ্ণপ্রেম' উদিত হয় সেইটিই হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ এবং জীবনের পরম প্রাপ্তি। সমস্ত শাস্ত্রে সকাম কর্মের নিন্দা করা হয়েছে তাই সকাম কর্ম ত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ, কর্ম থেকে কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তি লাভ করা যায় না। মুক্তি এবং কর্ম, এই দুটি বস্তুই ভক্তেরা পরিত্যাগ করেন। আপনি সেই দুটিকে 'সাধ্য' এবং 'সাধন' বলে স্থাপন করার চেষ্টা করছেন? মহাপ্রভুর কথা শুনে তত্ত্ববাদী আচার্য লজ্জিত হলেন এবং তাঁর বৈষ্ণবতা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তত্ত্ববাদী আচার্য উত্তর দিলেন, 'আপনি যা বললেন তা অবশ্যই সত্য। সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্তই সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবুও শ্রীল মধ্বাচার্য যে পন্থা প্রদর্শন ক'রে গেছেন, আমরা সম্প্রদায় সম্বন্ধে তা আচরণ করছি'।

প্রশ্ন-৬১। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

প্রভু কহে,—কর্মী, জ্ঞানী,— দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন।। (৯-২৭৬)
সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ করি' ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে।। (৯-২৭৭)
এইমত তাঁর ঘরে গর্ব চূর্ণ করি'।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি।। (৯-২৭৮)
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি' তাহাঁ দেবতা-মন্দিরে।। (৯-৩০৪)
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'।। (৯-৩০৫)
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল।। (৯-৩০৬)
'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে।। (৯-৩০৭)
'ব্রহ্মসংহিতা', 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্নপ্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা।। (৯-৩০৯)

‘সপ্ততাল-বৃক্ষ’ দেখে কানন-ভিতর।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থুল, অতি উচ্চতর।। (৯-৩১২)
সপ্ততাল দেখি’ প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল।। (৯-৩১৩)
শূণ্যস্থল দেখি’ লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে, এ সন্ন্যাসী—রাম-অবতার ।। (৯-৩১৪)
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম।। (৯-৩১৫)
সপ্ত গোদাবরী আইলা করি’ তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর।। (৯-৩১৮)
রামানন্দ রায় শুনি’ প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন।। (৯-৩১৯)
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে।। (৯-৩২৯)
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে,—এই লাগি’ মিলিতে কহিল।। (৯-৩৫৭)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, ‘কর্মী এবং জ্ঞানী, উভয়ই ভক্তিহীন। অথচ আপনাদের সম্প্রদায়ে সেই বৈচিত্র্যই বর্তমান দেখছি। আপনাদের সম্প্রদায়ে আমি কেবল একটি গুণ দেখছি; তা হচ্ছে আপনারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে সত্য বলে স্বীকার করেন’। এইভাবে তত্ত্ববাদীদের গর্ব চূর্ণ ক’রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ফল্গুতীর্থ নামক স্থানে গমন করলেন। তারপর মহাপ্রভু কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে গেলেন এবং সেখানে তিনি নানা তীর্থ এবং বহু মন্দির দর্শন করলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজের সকলে ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত এবং তারা সকলে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর-রচিত ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ পাঠ করতেন। ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ শ্রবণ ক’রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা আনন্দিত হলেন এবং গভীর আগ্রহে তিনি সেই গ্রন্থটি লিখিয়ে নিলেন। ‘কৃষ্ণকর্ণামৃতে’র মতো গ্রন্থ ত্রিভুবনে আর নেই। এই গ্রন্থটি পাঠ করার ফলে শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেম লাভ হয়। ‘ব্রহ্ম-সংহিতা’ এবং ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ এই দুইটি গ্রন্থকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবচাইতে দুর্লভ দুটি রত্ন বলে মনে করেছিলেন, তাই তিনি সেই দুটি গ্রন্থ তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেই অরণ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ‘সপ্ততাল বৃক্ষ’ দর্শন করেন। এই সাতটি তাল বৃক্ষ অত্যন্ত প্রাচীন, অত্যন্ত স্থুল এবং অত্যন্ত উঁচু ছিল। দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল দর্শন ক’রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তার ফলে সেই বৃক্ষগুলি সশরীরে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করল। যেখানে সপ্ততাল বৃক্ষ ছিল, সেই স্থানটি শূণ্য দেখে লোকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন, এবং তাঁরা বলতে লাগলেন, ‘এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই শ্রীরামচন্দ্রের অবতার। যাঁর স্পর্শে তালবৃক্ষগুলি সশরীরে বৈকুণ্ঠধাম গমন করল। এক শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া এরকম শক্তি আর কার আছে’? বহু তীর্থ দর্শন ক’রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সপ্তগোদাবরীতে এলেন। তারপর সেখান থেকে বিদ্যানগরে ফিরে এলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমণের সংবাদ পেয়ে রামানন্দ রায় মহানন্দে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। রামানন্দ রায় এবং মহাপ্রভু দিবা-রাত্র কৃষ্ণ কথা আলোচনা করতেন এবং এইভাবে পরম আনন্দে তাঁরা পাঁচ-সাত দিন কাটালেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, ‘এক রামানন্দ রায় আমাকে বহু আনন্দ দিয়েছে’। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, ‘সেইজন্যই আমি তোমকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলাম’।

প্রশ্ন-৬২। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
অভয়-দান দেহ’ যদি, করি নিবেদনে।। (১১-৩)
প্রভু কহে,—কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়।। (১১-৪)
সার্বভৌম কহে—এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায়।। (১১-৫)
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে ‘নারায়ণ’।
সার্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন।। (১১-৬)
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ।।(১১-৭)
সার্বভৌম কহে,—সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম।। (১১-৯)

প্রভু কহে,—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।। (১১-১০)
রায় কহে,—তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল।। (১১-১৮)
তোমার যে বর্তন, তুমি খাও সেই বর্তন।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ।। (১১-২২)
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ।। (১২-৪৬)
শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।। (১২-৫১)
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি।। (১২-৫৬)

শ্লোকার্থঃ একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, 'তুমি যদি আমাকে অভয় দাও, তাহলে তোমাকে আমি কিছু বলব'। মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, 'তুমি যা আমাকে বলতে চাও, তা নির্ভয়ে বল। যোগ্য হ'লে আমি তোমার কথা রাখব, আর অযোগ্য হ'লে রাখব না'। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন তাঁকে বললেন, 'মহারাজ প্রতাপরুদ্র তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন'। সেই কথা শোনামাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কানে হাত দিয়ে নারায়ণকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, 'সার্বভৌম, কেন তুমি এই ধরণের অনুচিত অনুরোধ করছ? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী; তাই আমার পক্ষে রাজাকে দর্শন করা কোনো স্ত্রীলোককে দর্শন করারই মতো। এই উভয় দর্শনই বিষভক্ষণের মতো ভয়ঙ্কর'। ভট্টাচার্য বললেন, 'মহাপ্রভু, তুমি যা বলেছ তা সত্যি, কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্র একজন সাধারণ রাজা নন। তিনি জগন্নাথদেবের সেবক এবং একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত'। মহাপ্রভু বললেন, 'কিন্তু তাহলেও রাজা কালসর্পের মতো ভয়ঙ্কর। কাঠের তৈরি নারীমূর্তি স্পর্শ করলে যেমন চিত্তের বিকার হয়, তেমনই রাজাকে দর্শন করলেও বিষয়াসক্তির উদয় হয়'। রামানন্দ রায় বললেন, 'আমি আমার প্রতি তোমার আদেশের কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে জানিয়েছিলাম। তোমার ইচ্ছায়, রাজা আমাকে বৈষয়িক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করেছেন। তুমি যে বেতন পেতে, রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তুমি সেই বেতনই পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণের সেবা কর। রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করলেন--'দয়া ক'রে একবার তুমি প্রতাবরুদ্রকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের দর্শন দান কর'। মহাপ্রভু বললেন, 'সাদা কাপড়ে যেমন কালির দাগ লুকায় না, তেমনই সন্ন্যাসীর আচরণে অল্পদোষ দেখলেই লোকেরা সে কথা বলাবলি করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পুত্র পিতার থেকে অভিন্ন; তাই তার পুত্রের সঙ্গে আমার মিলন হ'লে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ব'লে মনে করবেন'। রাজপুত্রের পরণে পীত বসন এবং তার সারা অঙ্গে নানা প্রকার রত্ন আভরণ ছিল। তাকে দেখে মহাপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হল। পুত্রকে আলিঙ্গন ক'রে মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রেমাবিষ্ট হলেন, যেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্পর্শ পেলেন।

প্রশ্ন-৬৩। চৈ.চ.ম-১ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা 'উদ্দীপন'।। (১২-৫৯)
তাঁরে দেখি, মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিল।। (১২-৬০)
পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা।। (১২-৬৭)
পূর্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন।। (১৩-১২৪)
জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল।। (১৩-১২৫)
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হৈল অবসান।। (১৪-৭৩)
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন।। (১৪-১২৩)

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ।। (১৪-১৫৭)
'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন।। (১৪-১৫৯)
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী।
নির্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি।। (১৪-১৬০)
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা'।। (১৪-১৬১)
বাম্য-স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর।। (১৪-১৬২)
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু।। (১৪-২১৯)

শ্লোকার্থঃ রাজপুত্রের পরণে পীত বসন, এবং তার সারা অঙ্গে নানাপ্রকার রত্ন আভরণ ছিল। তাকে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হ'ল। সেজন্য তিনি তাকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে দর্শন করেছেন। পুত্রকে—আলিঙ্গন ক'রে মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রেমাবিষ্ট হলেন, যেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্পর্শ পেলেন। পূর্বে যেমন ব্রজগোপীকারা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন ক'রে মহাপ্রভুর সেই ভাবের উদয় হ'ল। সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে তিনি স্বরূপ দামোদরকে দিয়ে একটি ধুয়া গাইয়েছিলেন। তখন মহাপ্রভু অনুভব করতেন যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে এসেছেন। তাই তখন তাঁর বিরহের অবসান হয়েছিল। বৃন্দাবন লীলায় কেবল ব্রজগোপীকারাই শ্রীকৃষ্ণের সহায়। ব্রজগোপীকারা ছাড়া কেউই শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারেন না। গোপীকাদের প্রেমে কোনো রকম রসাভাস বা দোষ নেই; তাই তা শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তুষ্টি বিধান করে। গোপীগণ দুই প্রকার—'বামা' ও 'দক্ষিণা'। তাঁরা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে রস আস্বাদন করান। 'বামা' অর্থাৎ যাঁদের মান হয়, 'দক্ষিণা' অর্থাৎ সরল-সহজ—তাঁদের মান হয় না। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রেষ্ঠা। তিনি নির্মল, উজ্জ্বল রসের আধার এবং প্রেমরূপ রত্নের আকর। শ্রীমতী রাধারাণীর বাম্য-স্বভাব এবং মানের উদয় হয়। শ্রীমতী রাধারাণী বয়সে—'মধ্যমা', স্বভাবে—'সমা' এবং নিরন্তর—'বামা'। শ্রীমতী রাধারাণীর বাম্য-স্বভাব থেকেই মানের উদয় হয় এবং তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তহীন আনন্দ উপভোগ করেন। সর্পের মতোই বাম্য-প্রেমের স্বভাব—কুটিল গতি। সেইজন্য, যুবক-যুবতীর মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুই প্রকার মানের উদয় হয়। সে কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরের আনন্দ সমুদ্র উদ্বেলিত হ'ল। বৃন্দাবনের স্বাভাবিক সম্পদ সমুদ্রের মতো অন্তহীন, আর দ্বারকা এবং বৈকুণ্ঠের সম্পদ তার একবিন্দু মাত্র। এইভাবে মহাপ্রভু প্রেমের বন্যায় ভাসালেন।

প্রশ্ন-৬৪। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

দীক্ষা-পুরশ্চর্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।। (১৫-১০৮)
পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ।। (১৫-২৬৫)
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে।। (১৬-৭২)
যাঁহার দর্শনে মুখে' আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'।। (১৬-৭৪)
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায়।। (১৬-১৬৬)
এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল।
আমার আপন-'বিশ্বাস' উড়িয়া স্থানে পাঠাইল।। (১৬-১৬৯)
শুনি' মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময়।
'মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়।। (১৬-১৭৪)
আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল।
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল'।। (১৬-১৭৫)
'বিশ্বাস' যাএা তাঁহারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল।। (১৬-১৭৮)

দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা।। (১৬-১৭৯)
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম।। (১৬-১৮০)
অধম যবনকুলে কেন জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইল।। (১৬-১৮১)
'হিন্দু' হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ।। (১৬-১৮২)

শ্লোকার্থঃ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, দীক্ষা-পুরশ্চর্যা ইত্যাদি বিধির অপেক্ষা করে না, কেবলমাত্র জিহ্বাকে স্পর্শ করার প্রভাবেই তা আচণ্ডাল সকলকে উদ্ধার করে। অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনের এমনই প্রভাব যে তা দীক্ষা-বিধির অপেক্ষা করে না। কেবলমাত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করা যায়। এখানে জিহ্বা শব্দে 'সেবোন্মুখ' জিহ্বাকেই বুঝতে হবে। 'পতি যদি অধঃপতিত হয়, তাহলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত'। ভগবানের ইচ্ছায় এই ধরণের বিচ্ছেদ কখনোই নিন্দনীয় নয়। তার পতি যদি পতিত না হয়, তাহলে তার পতির অনুরক্ত হয়ে সেবা করা উচিত। 'যাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ভজনা কর'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে তাকে উত্তম বৈষ্ণব ব'লে জেনো। সেই সমস্ত লোকেরা ঠিক উন্মাদের মতো। কৃষ্ণনাম ক'রে তারা নাচে, কাঁদে এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। সে কথা শুনে সেই মুসলমান নবাবের মনোভাব পরিবর্তন হ'ল, এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্যকে উৎকল রাজার প্রতিনিধির কাছে পাঠালেন। সেই প্রস্তাব শুনে উড়িষ্যা রাজার প্রতিনিধি, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মদ্যপ যবনের চিত্ত কে এইভাবে পরিবর্তন করল'? যাঁর দর্শনে এবং স্মরণে সারা জগৎ উদ্ধার লাভ করে, সেই মহাপ্রভুই তার মনের পরিবর্তন করেছেন। বিশ্বাস ফিরে গিয়ে সেই যবনকে সমস্ত কথা জানালেন এবং সেই যবন হিন্দুর বেশ ধারণ ক'রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে এলেন। সম্মান ক'রে মহাপাত্র তাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে এলেন এবং তিনি তখন হাত জোড় ক'রে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে লাগলেন। সেই নবাব তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে লাগলেন, 'কেন অধম যবনকুলে আমার জন্ম হ'ল? বিধি কেন আমাকে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করাল না? আমি যদি হিন্দু হতাম তাহলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করতে পারতাম। আমার এই দেহ ব্যর্থ, এখনই আমার মৃত্যু হোক'।

প্রশ্ন-৬৫। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হঞা।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া॥ (১৬-১৮৩)
'চণ্ডাল—পবিত্র যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন-তোমার এই জীব পাইল দরশনে॥ (১৬-১৮৪)
ইহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময়?
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয়॥' (১৬-১৮৫)
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপাদৃষ্টি করি'।
আশ্বাসিয়া কহে,—তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি'।। (১৬- ১৮৭)
সেই কহে,—'মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ,—সেবা করি যে তোমার॥ (১৬- ১৮৮)
গো-ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবে হিংসা করিয়াছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার॥ (১৬-১৮৯)
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি' বহু সৈন্য সঙ্গে নিল॥ (১৬- ১৯৮)
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হাঞা॥ (১৬-২৩৮)
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥ (১৬-২৩৯)
নির্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥ (১৭-২৫)

প্রভু কহে,—কহ ‘কৃষ্ণ’, ব্যাঘ্র উঠিল।
‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ কহি’ ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ (১৭-২৯)
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান।। (১৭-৩০)

শ্লোকার্থঃ নবাবের এই বিনীত আবেদন শুনে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে মহাপাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধ'রে স্তুতি করতে লাগলেন। যার শ্রীনাম শ্রবণ ক'রে চণ্ডাল পর্যন্ত পবিত্র হয়, সেই তোমার দর্শন এই জীব পেয়েছে। এর যে এই গতি হয়েছে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে? তোমার দর্শনের প্রভাবে এই রকমই হয়। তখন মহাপ্রভু সেই মুসলমান নবাবের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে, তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি ‘কৃষ্ণ’ ‘হরি’ বল। মুসলমান নবাব তখন বললেন, ‘আপনি যদি কৃপা ক'রে আমাকে অঙ্গীকার করলেন, তাহলে আপনি দয়া ক'রে আমাকে আদেশ দিন যাতে আমি আপনার কিছু সেবা করতে পারি। আমি অসংখ্য গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ‘বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করেছি, সেই পাপ থেকে আমাকে আপনি উদ্ধার করুন’। জলদস্যুর ভয়ে দশটি নৌকায় বহু সৈন্য নিয়ে সেই যবন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে চললেন। লোকের কাছে বাহবা পাবার জন্য কপট বৈরাগ্যের অভিনয় করো না; অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বললেন, ‘অন্তরে নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের সেবা কর, কিন্তু বাইরে একজন সাধারণ বিষয়ীর মতো আচরণ কর। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি অচিরেই সন্তুষ্ট হবেন এবং মায়ার বন্ধন থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন’। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নির্জন বনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে করতে যাচ্ছিলেন, তখন হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুরা মহাপ্রভুকে দেখে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। মহাপ্রভু বললেন, ‘কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর’। বাঘটি ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ব'লে নাচতে লাগল। আর একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীতে স্নান করছিলেন, তখন একপাল মত্তহস্তী সেই নদীতে জল পান করতে আসে।

প্রশ্ন-৬৬। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

প্রভু জল-কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
‘কৃষ্ণ কহ’ বলি’ প্রভু জল ফেলি’ মারিলা ॥ (১৭-৩১)
সেই জল-বিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ কহে, প্রেমে নাচে, গায় ॥ (১৭-৩২)
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥ (১৭-৩৪)
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি’ চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ (১৭-৩৭)
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ’ করি’ প্রভু যবে বলিল।
‘কৃষ্ণ’ কহি’ ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল।। (১৭-৪০)
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ (১৭-৪২)
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, ‘কৃষ্ণ’ বলি’ নাচে মত্ত হঞা ॥ (১৭-৪৪)
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
‘বেদান্ত’ পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥ (১৭-১০৪)
‘বেদান্ত’ শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥ (১৭-১২১)
প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’ ‘চৈতন্য’ কহে নিরবধি ॥ (১৭-১২৯)
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণস্বরূপ’—দুইত ‘সমান’।। (১৭-১৩০)
‘নাম’, ‘বিগ্রহ’, ‘স্বরূপ’—তিন একরূপ।
তিনে ‘ভেদ’ নাহি,—তিন ‘চিদানন্দ-রূপ’।। (১৭-১৩১)
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ‘ভেদ’।
জীবের ধর্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে ‘বিভেদ’ ॥ (১৭-১৩২)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নান ক'রে মন্ত্র জপ এবং স্মরণ করছিলেন, তখন সেই হাতির পাল তাঁর সামনে আসে, মহাপ্রভু তখন 'কৃষ্ণ কহ' বলে তাদের গায়ে জল ছেটালেন। সেই জল-কণা হাতিদের গায়ে লাগা মাত্রই তারা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ব'লে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেছিল এবং নাচতে শুরু করেছিল। পথে যেতে যেতে মহাপ্রভু উচ্চ সংকীর্তন করছিলেন, তাঁর মধুর কণ্ঠ ধ্বনি শুনে হরিণীরা তাঁর কাছে এসেছিল। সেই সময় পাঁচ-সাতটি বাঘ সেখানে এল, এবং বাঘ ও হরিণীরা একত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলতে লাগল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বললেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল', তখন বাঘ এবং হরিণেরা কৃষ্ণ ব'লে নাচতে লাগল। ব্যাঘ্র ও হরিণেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগল, এবং পরস্পরের মুখ চুম্বন করতে লাগল। ময়ূর আদি পাখীরা মহাপ্রভুকে দেখে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল, এবং কৃষ্ণ- প্রেমে উন্মত্ত হয়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ক'রে নাচতে লাগল। শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী সভাতে বসে তাঁর বহু শিষ্যদের নিয়ে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতেন। প্রকাশানন্দ শিষ্যদের কাছে বললেন, 'এই চৈতন্যের কাছে না গিয়ে বেদান্ত শ্রবণ কর'। কেননা দুষ্টলোকের সঙ্গ করলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নাশ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী। তাই তারা নিরন্তর ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য শব্দ উচ্চারণ করে, কিন্তু তাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না, কেননা শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দুই-ই সমান। ভগবানের দিব্যনাম, তাঁর শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁর স্বরূপ এক ও অভিন্ন। এই তিনে কোনো ভেদ নেই। এই তিনই চিদানন্দরূপ। জীবের যেমন নাম, দেহ এবং স্বরূপে পার্থক্য রয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং দেহীর মধ্যে অথবা নাম এবং নামীর মধ্যে সেরকম পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন-৬৭। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

আরিটে রাধাকুণ্ড-বার্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।। (১৮- ৪)
তীর্থ 'লুপ্ত' জানি' প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান ॥ (১৮-৫)
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন।। (১৮-৬)
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় 'প্রিয়ার সরসী' ॥ (১৮-৭)
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ (১৮-৮)
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥ (১৮-৯)
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ॥ (১৮-১০)
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা'।। (১৮-১১)
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥ (১৮-১৫৯)
সেই বৃক্ষ-নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥ (১৮-১৬০)
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥ (১৮-১৬১)

শ্লোকার্থঃ আরিট্ গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাধাকুণ্ড কোথায়'? কিন্তু কেউই তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, এবং তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণটিও সে সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। মহাপ্রভু তখন বুঝতে পারলেন যে রাধাকুণ্ড লুপ্ত হয়েছে। তখন সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু'টি ধানক্ষেতে অল্প জলে স্নান করলেন। মহাপ্রভুকে সেই দুটি ধানক্ষেতে অল্প জলে স্নান করতে দেখে গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মহাপ্রভু তখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে রাধাকুণ্ডের স্তব করতে লাগলেন। সমস্ত গোপিকাদের মধ্যে রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। তেমনই রাধাকুণ্ড নামক শ্রীমতী রাধারাণীর সরোবর শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, কেননা তা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয়। "শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়"। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে জলক্রীড়া করেন এবং তার তীরে রাসনৃত্য করেন। সেই কুণ্ডে যিনি একবার স্নান করেন, তাকেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর মতো প্রেম দান করেন। রাধাকুণ্ডের মাধুরী

শ্রীমতী রাধারাণীর মধুরিমার মতো এবং সেই কুঞ্জের (সরোবরের) মহিমা যেন শ্রীমতী রাধারাণীরই মহিমা। পথ চলতে চলতে, মহাপ্রভু সকলের পথশ্রান্তি অনুভব ক'রে, তাদের সকলকে নিয়ে একটি গাছের তলায় বসলেন। সেই বৃক্ষের নিকটে বহু গাভী চরছিল। তা দেখে মহাপ্রভু অন্তরে উল্লসিত হয়েছিলেন। তখন হঠাৎ এক গোপ-বালক বংশী বাজাল। তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন।

প্রশ্ন-৬৮। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাশায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা।। (১৮-১৬২)
হেনকালে তাহাঁ আশোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা।। (১৮-১৬৩)
প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।। (১৮-১৬৪)
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াঞা।
মারি' ডারিয়াছে, যতির সব ধন লঞা।। (১৮-১৬৫)
তবে সেই পাঠান চারি-জনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।। (১৮-১৬৬)
কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র—নির্ভয়, সে—মুখে বড় দড়।। (১৮-১৬৭)
বিপ্র কহে,—পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি, আমি সিকদার-পাশ যাই।। (১৮-১৬৮)
এই যতি—আমার গুরু, আমি—মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাঁৎসার আগে আছে মোর 'শত জন'।। (১৮-১৬৯)
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মুর্ছিত।
অবহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত।। (১৮-১৭০)
ক্ষণেক ইহা বৈস, বান্ধি' রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া, তবে মারিহ সবারে।। (১৮-১৭১)
পাঠান কহে,—তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।
'গৌড়িয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন।। (১৮-১৭২)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়লেন, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা পড়তে লাগল এবং তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হ'ল। সেই সময় দশজন পাঠান-ঘোড়সওয়ার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং ঘোড়া থেকে নামলেন। মহাপ্রভুকে দেখে তারা ভাবলেন, এই সন্ন্যাসীর কাছে নিশ্চয়ই অনেক সোনা ছিল। এই চারটি বাটপাড় নিশ্চয়ই এই সন্ন্যাসীটিকে ধুতুরা খাইয়ে মেরে ফেলে তাঁর সমস্ত ধন অপহরণ ক'রে নিয়েছে। সেই পাঠানেরা তখন চারজনকে বাঁধলেন এবং তাদের হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তার ফলে গৌড়িয়া দুইজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক, সনোড়িয়া ব্রাহ্মণটিও ছিলেন নির্ভীক, এবং তিনি মুখে খুব সাহস দেখাতে লাগলেন। সেই ব্রাহ্মণটি বললেন, 'তোমরা পাঠান সৈনিকেরা বাদশাহের অনুগত। চল তোমাদের সিকদারের (সেনাপতির) কাছে ন্যায্য বিচারের জন্য যাই। এই সন্ন্যাসী হচ্ছেন আমার গুরু, এবং আমি মথুরার ব্রাহ্মণ। বাদশাহের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে আমি চিনি। ব্যাধির প্রভাবে এই সন্ন্যাসী কখনও কখনও মূর্ছিত হন। আপনারা দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, এবং তাহলেই দেখবেন যে অচিরেই তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে সুস্থ হবেন। আপনারা এখানে কিছুক্ষণ বসুন, এবং আমাদের সকলকে বেঁধে রাখুন, তারপর একে জিজ্ঞাসা ক'রে, আমাদের সকলকে হত্যা করবেন'। পাঠান সৈনিকেরা তখন বললেন, 'তোমরা সকলেই বাটপাড়। তোমরা দু'জন মথুরার অধিবাসী এবং এই দু'জন, যারা ভয়ে কাঁপছে, তারা গৌড়ের অধিবাসী'।

প্রশ্ন-৬৯। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

কৃষ্ণদাস কহে,—আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে।। (১৮-১৭৩)
এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা-সবা মারি'।। (১৮-১৭৪)
গৌড়িয়া—'বাটপাড়' নহে, তুমি—'বাটপাড়'।
তীর্থবাসী লুঠ,' আর চাহ' মারিবার।। (১৮-১৭৫)

শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।

হেনকালে মহাপ্রভু 'চৈতন্য' পাইল।। (১৮-১৭৬)

হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি'।

প্রেমাবেশে নৃত্য করে উর্ধ্ববাহু করি'।। (১৮-১৭৭)

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার।

ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার।। (১৮-১৭৮)

সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর।

কাল বস্ত্র পরে সেই, —লোকে কহে 'পীর'।। (১৮-১৮৫)

চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া।

'নির্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠায়া।। (১৮-১৮৬)

'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন।

তার শাস্ত্রযুক্ত্যে তারে প্রভু কৈলা খণ্ডন।। (১৮-১৮৭)

যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল।

উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল।। (১৮-১৮৮)

প্রভু কহে,—তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্বিশেষে'।

তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে।। (১৮-১৮৯)

শ্লোকার্থঃ রাজপুত কৃষ্ণদাস বললেন, 'এই গ্রামেই আমার ঘর, এবং আমার দুইশত তুর্কী সৈন্য আছে এবং একশত কামান আছে। আমি যদি চিৎকার ক'রে তাদের ডাকি, তাহলে তারা এক্ষুণি এখানে আসবে এবং তোমাদের সকলকে মেরে তোমাদের ঘোড়া এবং পিড়া লুটে নেবে। এই তীর্থযাত্রীরা বাটপাড় নয়, তোমরা বাটপাড়, কেননা তোমরা তীর্থযাত্রীদের মেরে তাদের ধন-সম্পদ লুট ক'রে নাও'। সেই কথা শুনে পাঠান সৈন্যরা অন্তরে সঙ্কুচিত হলেন এবং সেই সময় মহাপ্রভু চেতনা ফিরে পেলেন। হুঙ্কার ক'রে উঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরি' 'হরি' বলতে লাগলেন এবং উর্ধ্ববাহু ক'রে প্রেমাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন। প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন চিৎকার করতে লাগলেন, তখন সেই মুসলমান সৈনিকদের হৃদয়ে তা যেন বজ্রাঘাত করতে লাগল। সেই ম্লেচ্ছদের মধ্যে একজন ছিলেন পরম গম্ভীর, তার পরণে কালো বস্ত্র এবং লোকেরা তাকে বলত 'পীর'। মহাপ্রভুকে দর্শন ক'রে তার চিত্ত আর্দ্র হয়েছিল এবং তিনি তার শাস্ত্রের যুক্তি প্রদর্শন ক'রে 'নির্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপন করার চেষ্টা করলেন। তিনি যখন কোরাণের ভিত্তিতে 'অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ' স্থাপন করলেন, তখন তাঁর শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা মহাপ্রভু তার মতবাদ খণ্ডন করলেন। তিনি যে যে যুক্তি প্রদর্শন করলেন, মহাপ্রভু একে একে তার সবকটি যুক্তি খণ্ডন করলেন। তখন তার মুখে আর কোন কথা এল না এবং তারা সকলে স্তব্ধ হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'তোমাদের শাস্ত্র কোরাণে অবশ্যই নির্বিশেষবাদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' কিন্তু কোরাণের শেষে সেই নির্বিশেষ তত্ত্ব খণ্ডন ক'রে সবিশেষ তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৭০। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।

'সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম কলেবর।। (১৮-১৯০)

'কর্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন।

সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন'।। (১৮-১৯৬)

তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।

পূর্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্।। (১৮-১৯৭)

নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া।

কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া।। (১৮-১৯৮)

ম্লেচ্ছ কহে,—যেই কহ, সেই 'সত্য' হয়।

শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয়।। (১৮-১৯৯)

'নির্বিশেষ-গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান।

'সাকার-গোসাঞি'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান।। (১৮-২০০)

সেইত 'গোসাঞি' তুমি—সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর'।

মোরে কৃপা কর, মুঞি—অযোগ্য পামর।। (১৮-২০১)

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে।

'সাধ্য-সাধন-বস্তু' নারি নির্ধারিতে।। (১৮-২০২)

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম'।
'আমি—বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান।। (১৮-২০৩)
কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে'।
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে।। (১৮-২০৪)
প্রভু কহে,—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা।
কোটি-জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হইলা।। (১৮-২০৫)

শ্লোকার্থঃ কোরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে চরমে ভগবান একই। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যেপূর্ণ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জল ভরা মেঘের মতো। কোরাণে কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ আগে স্থাপন ক'রে, সেগুলি সব খণ্ডন ক'রে ভগবানের সবিশেষ রূপ এবং তাঁর সেবার মহিমা স্থাপন করা হয়েছে। মহাপ্রভু বললেন,—'তোমার পণ্ডিতদের যথাযথ শাস্ত্র-জ্ঞান নেই, যদিও তোমাদের শাস্ত্রে বহু প্রকার বিধির অনুশীলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা জানে না যে তার চরম সিদ্ধান্তই হচ্ছে সবচাইতে বলবান। তোমার নিজের শাস্ত্র কোরাণ দেখে এবং সেখানে কি লেখা রয়েছে তা বিচার ক'রে কি সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে তা আমাকে বল'? সেই সাধু মুসলমানটি উত্তর দিলেন, 'আপনি যা বললেন তা সত্যি। কোরাণে তা অবশ্যই লেখা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা তা বুঝতে পারে না এবং গ্রহণ করতে পারে না। তারা কেবল ভগবানের নির্বিশেষ রূপেরই ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপ যে সকলেরই সেব্য, সে সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আপনি হচ্ছেন সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান, আপনি দয়া ক'রে আমাকে কৃপা করুন। আমি অযোগ্য পামর। আমি অনেক মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু তা থেকে আমি নির্ধারণ করতে পারিনি জীবনের পরম উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনাকে দেখে আমার জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছে। নিজেকে মস্ত বড় জ্ঞানী ব'লে মনে করার মিথ্যা অভিমান আমার দূর হয়েছে'। এই ব'লে সেই মুসলমানটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তা প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিতে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'ওঠো, তুমি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছ, তার ফলে তোমার কোটি কোটি জন্মের পাপ দূর হয়ে গেল। এখন তুমি পবিত্র হ'লে'।

প্রশ্ন-৭১। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ,— কৈলা উপদেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ।। (১৮-২০৬)
'রামদাস' বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম।
আর এক পাঠান, তাঁর নাম—'বিজলী-খাঁন'।। (১৮-২০৭)
'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায়।। (১৮-২০৯)
তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেইত পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা।। (১৮-২১০)
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি, হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি।। (১৮-২১১)
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।। (১৯-১৫১)
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা।। (১৯-১৫৮)
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ।। (১৯-১৫৯)
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়।। (১৯-১৬০)
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।। (২০-১১৭)
অভিধেয় নাম 'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।। (২০-১২৫)
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন।। (২০-১৪৩)

শ্লোকার্থঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সমস্ত মুসলমানদের বললেন, 'কৃষ্ণনাম কর! কৃষ্ণনাম কর'! এবং তাঁরা সকলে যখন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন তখন তাঁরা প্রেমাবিষ্ট হলেন। মহাপ্রভু সেই শুদ্ধ চরিত্র মুসলমানটিকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার উপদেশ দান ক'রে, পরোক্ষভাবে দীক্ষা দিয়ে, তাঁর নাম রাখলেন রামদাস। সেখানে আর একজন পাঠান ছিলেন যাঁর নাম ছিল বিজলী খাঁন। তিনি 'কৃষ্ণ' বলে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হলেন এবং মহাপ্রভু তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তার মাথায় স্থাপন করলেন। তাদের সকলকে কৃপা ক'রে মহাপ্রভু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সেই পাঠান মুসলমানেরা বৈরাগীতে পরিণত হলেন। পরে তাঁরা পাঠান বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁরা সর্বত্র মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন ক'রে ঘুরে বেড়াতেন। জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোনো জীব তার সৌভাগ্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, সদ্গুরুর কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখার মতো। জল পেয়ে উপশাখাগুলি বাড়তে থাকে, এবং তার ফলে ভক্তিলতা বাড়তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধ'রে জড়া-প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভক্তিকে বলা হয় 'অভিধেয়', এবং কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটি বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে, তার নাম 'প্রয়োজন'। প্রেম পুরুষার্থের শিরোমণি স্বরূপ। বৈদিক শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে পরম আকর্ষক, শ্রীকৃষ্ণে সেবাকে পরম কর্তব্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমকে জীবনের পরম প্রয়োজন ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষষ্ণপ্রেম এই তিনটি মহা সম্পদ।

প্রশ্ন-৭২। চৈ.চ.ম-২ গ্রন্থে শ্লোকগুলির অর্থ লিখ।

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।। (২২-৩১)
'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।। (২২-৫৪)
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।। (২২-১০৭)
বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।। (২২-১৪২)
বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুইত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।। (২২-১৫৬)
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।। (২২-১৫৭)
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য—ভগবান, সর্বমন্ত্র-বিচারণ।। (২৪-৩৩০)
সূত্রের পরিণাম-বাদ, তাহা না মানিয়া।
'বিবর্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া।। (২৫-৪১)
এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায়।। (২৫-৪২)
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য করিয়াছে আচ্ছাদন।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন।। (২৫-৪৪)

শ্লোকার্থঃ শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যকিরণের প্রকাশ হ'লে যেমন আর সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন মায়ার অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দূর হয়ে যায়। সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে এক নিমেষের জন্য শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ হ'লে সর্বসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তার উদয় সম্ভব। শুদ্ধ ভক্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধি-নিষেধগুলি ত্যাগ ক'রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ভজনা করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোনোরকম নিষিদ্ধ পাপ আচরণে তার স্পৃহা থাকে না। দুইভাবে এই বৈধিভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি সাধন করা যায়,—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ। স্বরূপ উপলব্ধি সত্ত্বেও উন্নত ভক্ত বাহ্যে নবীন ভক্তের মতো সমস্ত শাস্ত্রবিধি অনুশীলন করেন, বিশেষ ক'রে—শ্রবণ এবং কীর্তন। কিন্তু, অন্তরে তার সিদ্ধদেহে (সখীদেহে) তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে রাত্রি-দিন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। গুরুর লক্ষণ, শিষ্যের লক্ষণ, শিষ্যের গুরুকে পরীক্ষা, গুরুর শিষ্যকে পরীক্ষা, পরম আরাধ্যরূপে ভগবানের বর্ণনা এবং সমস্ত

বীজমন্ত্রের বিচার তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর। বেদান্ত-সূত্রের পরিণামবাদ না মেনে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করেছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য যে বেদান্ত-সূত্রের কল্পিত অর্থ প্রদান করেছেন, তা কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির অন্তরে আলোড়নের সৃষ্টি করে না। আসুরিক ভাবাপন্ন পাষণ্ডীদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য তিনি এইভাবে কদর্য করেছেন। শঙ্করাচার্য বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন ক'রে কল্পিত মতবাদ প্রচার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যা বলেছেন, তাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য, আর কোনো মতবাদতা বিকৃত।

প্রশ্নপত্র

(compulsory)

সময়–তিন ঘণ্টা পূর্ণ মার্ক–১৫০

৭৩। বৈধিভক্তিতে ব্রজভাব পাওয়া যায় না, রাগানুগ-মার্গেই মাধুর্যরসের ভক্তগণ সখীভাবে কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করিতে পারেন। ইহার সমর্থনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত দশটি শ্লোক লিখ। ৩০

৭৪। রায় রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর আলোচনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের 'সাধ্যবস্তু ও শেষপ্রাপ্তি' নির্ণয় করিলেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে চারটি শ্লোক লিখ এবং রামানন্দ প্রভু রচিত শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহভাবের গীতটি লিখ ও গীতটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ১২+১০+৮=৩০

৭৫। কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে অত্যন্ত মাধুর্যমন্ডিত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহভাবের শেষ কথাবার্তা হইয়াছিল। তখন রাধারাণীর মনের ভাবনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখিত চারটি শ্লোক লিখ। রাধারাণী কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে আবেদন করেন এবং সেই আবেদনের বর্ণনা প্রসঙ্গে এগারোটি শ্লোক উল্লেখ্য কর। ৬+৯+১৫=৩০

৭৬। স্যমন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে রাধারাণী কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে আবেদন করিলে ব্রজে ফিরিয়া আসিবার জন্য কৃষ্ণ রাধারাণীকে আশ্বাস দেন। বিরহভাবে এই আশ্বাসবাণীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সাতটি শ্লোক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে লিখ। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণ রাধারাণীকে একটি শ্লোক বলেন, শ্লোকটি অর্থসহ উল্লেখ কর। ২১+৩+৩=২৭

৭৭। রাধারাণীকে আশ্বাস দিলেও শ্রীকৃষ্ণ আর কোনোদিন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই প্রসঙ্গে সাধক যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসরচিত গীত শুনিতেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত দুইটি শ্লোক লিখ। রাধিকার বিরহভাবে অশ্রুসিক্ত চণ্ডীদাস রচিত তিনটি চরণ লিখ। ৩+৩+৯=১৫

৭৮। 'কিশোরীতন্ত্রে' ষড়গোস্বামীদেরকে মঞ্জরী বলা হইয়াছে। মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করিয়া সখীদের অনুগত এবং সখী হইয়া কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করা যায়। মঞ্জরীগণের আটটি ধ্যানমন্ত্র হইতে যেকোনো তিনটি ধ্যানমন্ত্র (অর্থ নহে) লিখ। ১৮

উত্তরপত্র

৭৩। সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।।
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ-তার এক বিন্দু।।
কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।।
রায় কহে,– কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত'।
নিরন্তর কামক্রীড়া– যাঁহার চরিত।।
রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে।।
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসাল্যাদি– ভাবে না হয় গোচর।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি।।

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।
সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্মলোক ত্যজি’ সে কৃষ্ণে ভজয়।।

৭৪। যেবা ‘প্রেম-বিলাস-বিবর্ত’ এক হয়।
তাহা শুনি’ তোমার সুখ হয়, কিনা হয়।।
এত বলি’ আপন-কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল।।
প্রভু কহে,– সাধ্যবস্তুর ‘অবধি’ এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয়।।
‘সাধ্যবস্তু’ সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি’ কহ, রায়, পাবার উপায়।।
“পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল।।
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ-মন মনোভব পেষল জানি’।।
এ সখী, সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি’।।
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্য ত পাঁচবাণ।।
অব সোহি বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী।
সু-পুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি।।”

এটি রামানন্দ প্রভু রচিত রাধারাণীর বিরহভাবের গীত। মিলনের পূর্বরাগ-সময়ে পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় থেকে 'রাগ' বলে একটি ভাবের উদয় হয়। আবার, এখন বিচ্ছেদের সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায়, অর্থাৎ বিশিষ্ট রাগ বা বিচ্ছেদ-গত রাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কাজ করছ। সুপুরুষের প্রেমের রীতি-নীতি এই রকম। বৃন্দাবন লীলাতেই রাধারাণীর বিরহভাব প্রকাশিত হয়। তারপর মহাপ্রভু ‘সাধ্যবস্তু’ পাওয়ার উপায় বর্ণনা করিতে বলিলেন। পরকীয়াভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহভাবে আকৃষ্ট হইলে কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করা যায়। ইহাই জীবের ‘সাধ্যবস্তু ও শেষপ্রাপ্তি’ যাহা মহাপ্রভু নির্ণয় করিলেন। (চৈঃচঃমঃলী-১, ৮-১৯৪ এর তাৎপর্য দেখ)

৭৫। কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে রাজবেশী কৃষ্ণের সম্মুখে সখীগণ সঙ্গে শ্রীরাধিকার মনের ভাবনা–

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন।।
রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপ-বেশ, কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন।।
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে।।

কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে শ্রীমতী রাধিকার কাতর আবেদন–

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম।।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ।।
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি।।
ইহাঁ রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন।।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।।
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত' পূরণে।।
প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ-আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন।।
বৃন্দাবন, গোবর্ধন, যমুনা-পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের ব্রজজন, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা।।
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়।।
না গণি আপন-দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে?
তুমি-ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ।।

৭৬। ব্রজবাসীদের প্রেমের মহিমা শ্রবণ করিয়া, তিনি নিজেকে তাঁহাদের কাছে 'ঋণী' বলিয়া মনে করিয়া, কৃষ্ণ রাধারাণীকে আশ্বাস দেন–

শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি',
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি' আপনাকে 'ঋণী' মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন।।

প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ-সত্য-বচন।

তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,

মোর দুঃখ না জানে কোনো জন।।

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,

সবে হয় মোর প্রাণসম।

তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,

তুমি মোর জীবনের জীবন।।

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,

আমি তোমার অধীন কেবল।

তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,

রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল।।

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,

তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।

তোমা-সনে ক্রীড়া করি', নিতি যাই যদুপুরী,

তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্তি।।

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,

সেই প্রেম-পরম প্রবল।

লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,

প্রকটেহ আনিবে সত্ত্বর।।

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,

আনিবে আমা দিন দশ বিশে।

পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,

বিলসিব রজনী-দিবসে।।

তারপর ... এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,

এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল।

সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খন্ডিল সকল বাধা,

কৃষ্ণপ্রাপ্তে প্রতীতি হইল।।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীকে নিম্নের শ্লোকটি শুনাইলেন--

ময়ি ভক্তির্হি ভূতনামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।।

"জীব আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে অমৃতত্ত্ব লাভ করে। হে ব্রজবালাগণ, তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ, তাহা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, কেননা, এই অনুরাগই আমাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়।" (শ্রীমদ্ভাগবতম্- ১০/৮২/৪৪)

৭৭। শ্রীমতী রাধারাণীকে আশ্বাস দিলেও কৃষ্ণ আর কোনোদিন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই। সেইজন্য সাধকের হৃদয়ে সর্বদা রাধারাণীর বিরহভাব জাগ্রত থাকে। তখন সাধক কুঞ্জসেবায় প্রবেশ করিতে যোগ্যতা অর্জন করিবেন এবং মঞ্জরীদের ধ্যানমন্ত্র জপ করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়া কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করিবেন। ইহাই জীবের 'শেষ প্রাপ্তি'।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চন্ডীদাসরচিত গীত শুনিতেন, এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক-

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চন্ডীদাসের গীত।

আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত।।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।।"

রাধিকার বিরহভাবে অশ্রুসিক্ত হইয়া চণ্ডীদাস গাইলেন–

(আমার) উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার।।
(আমার) উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ান তাঁরা।।
(আমার) গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হইল আঁখি।।

৭৮। এখানে লিখিত আটটি ধ্যানমন্ত্র হইতে যেকোনো তিনটি ধ্যানমন্ত্র (অর্থ নহে) লিখ।

রূপমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রূপগোস্বামী)--

"গোরোচনা নিন্দি নিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিঞ্ছাভ সূচীন বস্ত্রাম্।
শ্রীরাধিকাপাদ সরোজদাসীং রূপাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেহম্।।"

লবঙ্গমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল সনাতন গোস্বামী)--

"চপলাদ্যুতি নিন্দি কান্তিকাং শুভতারাবলি শোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজসুত প্রমোদিনীং প্রভজে তাং চ লবঙ্গমঞ্জরীম্।।"

সুবিলাসমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল জীব গোস্বামী)--

"স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং নিন্দিত ভ্রমর কান্তিকাম্বরাম্।
কৃষ্ণপদকমলোপসেবনীমর্চ্চায়ামি সুবিলাস মঞ্জরীম্।।"

রতিমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী)--

"তারালিবাসোযুগলং বসানাং তড়িৎ সমানস্বতনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাম্।।"

রসমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী)--

"হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা সংযুতাং বিকচচম্পক দ্যুতিম্।
চারুরূপগুণ সম্পদান্বিতাং সর্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে।।"

গুণমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী)--

"জবানিভদুকুলাঢ্যাং তড়িদালিতনুচ্ছবিঃ।
কৃষ্ণামোদকৃতাপেক্ষাং ভজেহং গুণমঞ্জরীম্।।"

কস্তুরীমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)-

বিশুদ্ধহেমাব্জকলেবরাভ্যাং কাচদ্যুতিচারুমনোজ্ঞচেলাম্ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজাম্যহং কস্তুরীমঞ্জরীকাম্ ।।

মঞ্জুলালীমঞ্জরীর ধ্যানমন্ত্র (শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী)-

প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং শোণাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাম্ ।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং তাং মঞ্জুলালীং নিয়তং ভজামি ।।

[শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের লেখা—'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা', সর্বোত্তম বৈষ্ণব সেবার বিবরণে বলা যায়, প্রথমতঃ স্বার্থের বিনিময়ে সেবা। এই সেবাতে বৈষ্ণবকে দক্ষিণা বা প্রণামী দেয়া হয় অর্থ অথবা অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যাদি। বৈষ্ণবকে প্রসাদ দেয়া একটা সেবা। ইহাতে বৈষ্ণব আনন্দ পান। আবার বৈষ্ণব গুরু-দক্ষিণা বা গুরু-প্রণামী বিষয়ে শিষ্যকে নিজের মনের ইচ্ছা পূরণ ক'রে দিতে বলেন। শাস্ত্রে পাওয়া যায়—কৃষ্ণ-বলরাম গুরু গৃহে শিক্ষা শেষ হওয়ার পর তাঁরা গুরুদেব সান্দিপনী মুনির নিকট গুরু-প্রণামী দেয়ার বিষয়ে গুরুদেবের ইচ্ছা জানতে চান, তিনি কি প্রার্থনা করেন। সান্দিপনী মুনি ও তাঁর স্ত্রী হারানো পুত্রকে উদ্ধার ক'রে দেয়ার জন্য কৃষ্ণ-বলরামের নিকট প্রার্থনা জানান। কৃষ্ণ-বলরামের প্রচেষ্টায় হারানো পুত্র ফিরে পান। কিছু দুষ্ট প্রকৃতির বৈষ্ণব, এমন কি সন্ন্যাস পর্যায়ের বিখ্যাত ভক্ত হয়ে স্ত্রী-শিষ্যকে বৈষ্ণব সেবার বিকৃত অর্থ ক'রে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়, এই বলিয়া যে এই রকম কার্যে বেশি আনন্দ পাওয়া যায় এবং শিষ্যার দেহ পবিত্র হয়ে ভগবানের ধামে শিষ্যা ফিরে যায়।

দ্বিতীয়তঃ ইহা দেখা যায়, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণব সেবার বিষয়ে বলা হয়েছে—শিষ্য যখন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে তখন গুরুদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাসেন এবং মনে করেন, 'আমার শিষ্য কত সফল হয়েছে'। তিনি এতই আনন্দ অনুভব করেন যে, তিনি হাসেন যেন তিনি শিষ্যের সাফল্য উপভোগ করছেন (চৈ.চ.আ.লী. ৭প, ৮১-৮২ দেখ)। শিষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য লাভ করে যদি সে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করতে পারে। তাহলে বৈষ্ণব সর্বাপেক্ষা বেশি আনন্দ পান যদি শিষ্য কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং সর্বশেষ্ঠ বৈষ্ণব সেবা হচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করার উপায় বর্ণনা করা। এখানে কোনো স্বার্থের বিনিময় নেই। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে কুঞ্জলীলায় প্রবেশের উপায় শিক্ষা লাভ করা, আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা, চিরস্থায়ী সুখের জায়গা 'ব্রজপুর' অর্থাৎ 'অন্তঃপুরে' কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করা, সেখানে সুখ কালের দ্বারা নষ্ট হয় না। ভগবৎ ধামের অন্যান্য স্থানের সুখ কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের খেলা কখনও কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; সেখানে কাল প্রবেশ করতে পারে না। গুরুদেব যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা জড় বিষয় লাভের জন্য শিষ্য গ্রহণ করেন, তাহলে সেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক একটি ব্যবসায় পরিণত হয়।]

(Pre-Ph.D/Master degree and Ph.D level)

N.B. Students will bring only ball-point pens, nothing else.

....

[Questions and answers must be in Bengali language.]

Answer the following question and submit within .... hours. Answer of the question must be within 10-20 (ten to twenty) sentences. (Bhagavatam এর প্রশ্ন-৩৩ English-এ উত্তর লেখা আছে)

(1) For Pre-Ph.D/Master degree: (a) BG-question no.21 to 32
(b) CC-question no.31 to 42

(২) For Ph.D: (a) BG-question no.33 to 42
(b) CC-question no.43 to 78